A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

মার্কস পাঠের ভূমিকা

ফরহাদ মজহার

গ্রন্থনা : মুসতাইন জহির

আগামী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১
প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল
লিপিবিন্যাস কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ঢাকা
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ১৭০.০০ টাকা

Marx Phater Vumuhika by Farhad Mazhar
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar Dhaka-1100 Bangladesh.
First Published : February 2011

Price :170.00 only

ISBN 978 984 04 1345 4

উৎসর্গ

বাংলাদেশে মার্কসের অনুরাগী ও অনুসারী
তরুণ প্রজন্মকে

মার্কস পাঠের ভূমিকা: প্রসঙ্গ কথা

কার্ল মার্কসের চিন্তারপ্রভাব ফরহাদ মজহার-এর যাবতীয় লেখালেখির মধ্যেই কমবেশি দেখা মিলে। কিন্তু এখানে একসাথ করা লেখাগুলার বিষয় সরাসরি কার্ল মার্কস। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, মার্কসের চিন্তার দিগন্ত যে সকল মৌলিক ধারণা আশ্রয় করে বিস্তৃত হয়েছে তার কয়েকটির সাথে পরিচয় ঘটানো। মার্কসের হাতে অর্থশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও প্রকরণ যে বাঁক নিয়েছে তার মৌলিকত্ব কোথায় এবং কিভাবে মার্কস ধ্রুপদী অর্থনীতির ভ্রান্ত অনুমানগুলো মোকবিলা করেছেন সেটা স্পষ্ট করে দেখানো। কিম্বা মার্কসের নামে চালু বদ্ধমূল ধারণা কাটিয়ে সরাসরি মার্কসের নিজের রচনা পাঠে উদ্বুদ্ধ করা।

এ সংকলনে একত্রিত লেখাগুলার বয়স দুই যুগ পার হয়েছে। সে হিসাবে অনেক পুরানা লেখা। কিন্তু বিষয় যখন মার্কসের চিন্তার নিবিষ্ট পাঠ এবং মার্কস বোঝাপড়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ তৈরি হওয়া অস্পষ্টতা কাটানোর পথ পরিষ্কার করা, তখন বলা যায় বাংলাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা এখনও ফুরায়নি। সময় বদলালেও যে প্রয়োজনে এই লেখাগুলা রচিত সে অভিষ্ঠ এখনো অনেকটা অধরা। এ বাবদ পাঠকদের একটা ধারণা দেওয়া দরকার।

সময়টা উনিশ বিরাশি। হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সামরিক শাসন জারি করেছেন। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা সবার আগে প্রতিবাদে নেমে পড়ল। ছাত্র সংগঠনের অগ্রগামী এবং উদ্যোগী ভূমিকা প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেই শুরুতে বাধা পায়। সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজেরাই অগ্রগামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই উদ্যোগে সামনের সারিতে থাকা একটা সংগঠন ছিল 'ছাত্র ঐক্য ফোরাম'। আর ছাত্র ঐক্য ফোরামের জন্ম হয় তৎকালে ছাত্রদের একটা রাজনৈতিক পাঠচক্র

থেকে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণ ও পরিচালনার প্রয়োজনে তখন দশ দফা রচিত হয়। এই প্রশ্নে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিশাবে ছাত্র ঐক্য ফোরাম তখন আন্দোলনের অভিমুখ নিছক সরকার পরিবর্তন বা নির্বাচনে সীমাবদ্ধ না করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান প্রসঙ্গের দিকে নিয়ে যাবার অবস্থান তুলে ধরে। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর বা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্মসূচি বনাম বিদ্যমান রাষ্ট্রের অধীনে নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তর -- এই দুই অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য ঘিরে যে শ্রেণী সমাবেশ ও মেরুকরণ দানা বাধতে থাকে তাতে দেখা যায় প্রচলিত বামপন্থী বা বিপ্লবী ধারার দলগুলোও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের মৌলিক প্রশ্নগুলা পাশকাটিয়ে পুরানা রাষ্ট্রকাঠামো ও সংবিধানকে বহাল রেখে নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচিকে প্রধান করে তোলে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রশ্নে বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের কর্তব্য এবং কর্মসূচি নির্ধারণের প্রশ্নে তৎকালে প্রচলিত ভাবধারার সাথে ছাত্র ঐক্য ফোরামের অবস্থানের পার্থক্যের মূল নিহিত মার্কসের চিন্তা, বিশেষত শ্রেণী, সম্পত্তি, উৎপাদন এবং উৎপাদন সম্পর্ক ইত্যাদি মৌলিক ধারণাগুলো সম্পর্কে বোঝাপড়ায়। ফলত, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কর্তব্যকর্ম নিরূপনে নীতি ও কৌশলগত অবস্থানেও তৈরি হয় ভিন্নতা। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দান থেকে উঠে আসা এইসব প্রশ্নের উত্তর মার্কসের পর্যালোচনা এবং বোঝাপড়ায় কি করে মীমাংসার করতে হবে তা নিয়ে ফোরামের কর্মীদের পাঠচক্রের আলোচনার খসড়া আকারে প্রথম এই লেখাগুলা তৈরি হয়। পরে তা ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে বিতরণের জন্য বের করা হয়েছিল। ইতোমধ্যেই ফরহাদ মজহার মার্কসের 'অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার ভূমিকা' নামে লেখাটি অনুবাদ শেষ করেন। সেই লেখাটিও এই সংকলনভূক্ত করা হয়েছে।

অনেক দিন পরে আমাদের বন্ধুরা মিলে আবার যখন দুই হাজার তিন-চার সালের দিকে 'চিন্তা' পাঠচক্রে মার্কস পড়ছিলাম তখন এই লেখাগুলো আমাদের হাতে আসে। অনেকেই তখন এই লেখাগুলোকে একত্রিত একটা সংকলনভূক্ত পুস্তক আকারে সহজলভ্য করতে বলেন।

যাতে করে বিভিন্ন পাঠচক্র ও আগ্রহী তরুণদের জন্য তা কাজে লাগতে পারে। একটা সময় সেই উদ্যোগ নেয়ার পর মনে হয়েছিল অনেক বিষয়েই আরো বর্ধিত ও বিস্তারিত আলোচনা সংযুক্ত করার দরকার। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। যারা চাইছিলেন এরমধ্যে তাদের তাগাদাও থামেনি। তাই এখন অনেকের বারংবার তাড়া ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় অবশেষে নতুন কোন পরিমার্জনা ছাড়াই ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও জনগণের সংবিধান প্রণয়ণের যে প্রশ্নকে পাশকাটিয়ে নব্বইয়ে তথাকথিত গণঅভ্যুত্থানের তৃপ্তি সবাই নিতে চেয়েছিল তা আজ এত তিক্ত এবং রিক্ত হয়ে উঠেছে যা আর কাউকে বলে দিতে হবে না। এই অনিবার্য বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের তরুণরা পুরানো ভুল থেকে শিখতে এবং এখনকার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে সঠিক প্রশ্নটি ধরে এগিয়ে যেতে এই সংকলন কিছুটা হলেও সহায়ক হবে।

মুসতাইন জহির
০৮.০২.২০১১ ঢাকা, শ্যামলী।

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

শ্রেণী সম্পত্তি পুঁজি ১৩
"উৎপাদন ব্যবস্থা" বলতে কার্ল মার্কস কী বুঝতেন ১৫
পণ্য ঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ ব্যক্তি ২৭
শ্রেণী "এখানে এসে পাণ্ডুলিপি থেমে গিয়েছে" ৩২
পুঁজি ৩৯

দ্বিতীয় ভাগ

অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার ভূমিকা ৬৭
প্রসঙ্গকথা ৬৯
উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ বিনিময় (বিচলন) ৭৪
বিনিময় শেষের পর্যায় ও বিচলন ৯৪

প্রথম ভাগ

শ্রেণী সম্পত্তি পুঁজি

"উৎপাদন ব্যবস্থা" বলতে কার্ল মার্কস কী বুঝতেন

আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করবো মার্কসের একটি বিখ্যাত রচনাকে কেন্দ্র করে। রচনাটির নাম "অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার একটি ভূমিকা"। মূল রচনাটিকে কেন্দ্রে রেখে আমরা অন্যান্য দিকে অগ্রসর হবো। রচনাটি মার্কস লিখেছেন ১৮৫৭ সালে, "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার (১৯৪৮) লিখার ৯ বছর পর। আর "পুঁজি" প্রথম খণ্ড প্রকাশের ১০ বছর আগে। "পুঁজি" গ্রন্থ লিখার আগে মার্কস বিস্তর খসড়া করেছিলেন। সেসব খসড়া "গ্রুনড্রিসা" নামে পরিচিত এবং এই নামেই প্রকাশিত। সেসময় নিজের চিন্তাকে স্থিত করার খসড়া হিশাবে আলোচ্য রচনাটির উৎপত্তি।

পুরো রচনাটিকে বিষয় অনুসারে আমরা পাঁচভাগে ভাগ করতে পারি। শুরুতে রয়েছে ব্যক্তি ও সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কে মার্কসের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এরপর শুরুতে তিনি যে প্রসঙ্গ নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন, সে প্রসঙ্গেরই অনুসরণে জ্ঞানের পদ্ধতি সম্পর্কে খুবই মৌলিক কিছু বক্তব্য। জ্ঞানের পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা মূলত দর্শনের আলোচনা। মার্কস দর্শনকে সরাসরি বিষয় করে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। তাঁর অর্থশাস্ত্রীয় আলোচনাতেই প্রচ্ছন্নভাবে আছে, প্রধানত। এখানে জ্ঞানের পদ্ধতি নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন সে কারণে তা অত্যন্ত মূল্যবান।

এই গেলো দুই ভাগ। তৃতীয় ভাগে খোদ উৎপাদন সংক্রান্ত আলোচনা। এ আলোচনা এক জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গিয়েছে মনে হয়। রাষ্ট্র, পরিবার, শিল্পকলা সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য ছাড়া অধিক কিছু বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এখানে নেই। নিজেকে মনে করিয়ে দেবার মতো করে মার্কস নিজের নোটখাতায় এসব বিষয় সম্পর্কে লিখে রেখেছেন, "যেসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হবে এবং ভুলে যাওয়া চলবে

না" ইত্যাদি। দেখা যায় যে, "পুঁজি" গ্রন্থ রচনা তাঁর উদ্যম ও আয়ুকে এতো পরিমাণ দখল করে নিয়েছিলো যে, তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে তিনি ফিরে আসতে পারেন নি। সেসবের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের দায়িত্ব এসে পড়েছে তাঁর উত্তরসাধকদের কাঁধে। তাহলে চতুর্থ ভাগ হিশাবে এইসব অসম্পূর্ণ বিষয়গুলোকে একযোগে আমরা আলাদা করে রাখতে পারি।

শেষ ও পঞ্চম ভাগ হচ্ছে "অর্থশাস্ত্রের পদ্ধতি" সম্পর্কে আলোচনা। আলোচ্য রচনার মধ্যেই তা অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের মূল বিষয়ের জন্য তা খুবই প্রাসঙ্গিক। কোনো বিজ্ঞানের পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা দর্শনেরই বিষয় হিশাবে গণ্য। সে হিশাবে এই অংশ জ্ঞানের পদ্ধতি অংশেরই অন্তর্ভুক্ত। এই দুই অংশকে একসঙ্গে পাঠ করলে ফল লাভের সম্ভাবনা বেশি। তবে অর্থশাস্ত্রের পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনায় মার্কস একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্র নিয়ে যেহেতু আলোচনা করছেন সেহেতু প্রসঙ্গের নির্দিষ্টতা সম্পর্কে খেয়াল রাখা দরকার।

ব্যক্তি ও সামাজিক উৎপাদন

শুরুতে মার্কস যে কথাটা জোর দিয়ে বারবার বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে উৎপাদন কখনোই কোনো একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির সমাজ বিচ্ছিন্ন উৎপাদন নয়। উৎপাদন সবসময়ই সামাজিক। সমাজের বাইরে কোনো উৎপাদন নেই। উৎপাদনের উদাহরণ হিশাবে এডাম স্মিথ আর ডেভিড রিকার্ডোর রচনায় সমাজ বিচ্ছিন্ন একজন জেলের মাছ ধরার কিম্বা একজন শিকারির শিকার ধরার উল্লেখ থাকায় মার্কস এদিকটায় জোর দিয়েছেন। স্মিথ আর রিকার্ডো মার্কসের আগের দুই কৃতবিদ্য অর্থশাস্ত্রবিদ। তাঁদের মেধা ও প্রতিভার কাছে মার্কস নিজেও ঋণী। কিন্তু তাঁদের রচনা বুর্জোয়া সমাজের ব্যক্তিতান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন। তাঁদের দেখা ও বোঝার দৃষ্টি সবসময় ব্যক্তির দিক থেকে, সমাজের সামগ্রিকতার দিক থেকে নয়।

স্বাধীন, সকল প্রাকৃতিক বন্ধন থেকে মুক্ত ব্যক্তির উত্থান ঘটেছে আঠারো শতাব্দী থেকে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা পুরনো প্রাকৃতিক সম্পর্কগুলোকে ভেঙ্গে দেবার ফলেই সমাজে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। মানুষ মাত্রই ব্যক্তিতান্ত্রিক নয়। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিবোধের উদ্ভব ঘটে ইতিহাসের বিশেষ একটি পর্যায়ে, পুঁজিতন্ত্র বা বুর্জোয়া বিকাশের একটা

স্তরে গিয়ে। মানুষ সবসময়ই সামাজিক গোষ্ঠীবদ্ধ, পরিবারভুক্ত বা কোনো না কোনো ভাবে সমাজের অন্যসব সদস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভবের আগে মানুষ নিজেকে আলাদা করে ভাবতে পারতো না। বুর্জোয়া বা নাগরিক সমাজ এমন একটি সমাজ যেখানে ব্যক্তি সমাজ থেকে আলাদা। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক হচ্ছে স্বার্থপরতার। নিজের আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মাধ্যম হিশাবে সমাজ হাজির থাকে ব্যক্তির সামনে। ব্যক্তিতান্ত্রিক এই সমাজের আগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিলো প্রাকৃতিক বন্ধনের। প্রাকৃতিক বন্ধন বলতে মার্কস রক্তের সম্পর্ক, গোষ্ঠীগত সম্পর্ক কিম্বা পারিবারিক সম্পর্ক বুঝিয়েছেন। বুর্জোয়া সমাজ এসব পুরনো বন্ধন ভেঙ্গে দেয়। সেই ভাঙ্গনের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তির উদ্ভব। নতুন সমাজ গড়ে ওঠে ব্যক্তির স্বার্থপরতার ওপর। একজন ব্যক্তির কাছে আরসব ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মাধ্যম হিশাবে আবির্ভূত হয়।

এরকম ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভবের যুগে অর্থশাস্ত্রের আলোচনাও সমাজবিচ্ছিন্ন একাকী একজন ব্যক্তিকে দিয়ে শুরু হওয়া স্বাভাবিক। এ সমাজের পণ্ডিতদের এরকমই ধারণা হবার কথা যে, ইতিহাসের সকল কালপর্যায়ে ব্যক্তিই ছিলো সমাজের মৌল উপাদান। বুর্জোয়া পণ্ডিতদের দোষ হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের সমাজের সমস্ত লক্ষণগুলো শুধু অতীতের সমাজগুলোর ওপরেও আরোপ করে বসে থাকে না, তাঁরা ধরে নেন যে সমাজ মানেই সব যুগে ব্যক্তির সমষ্টি।

উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি। এ ব্যবস্থায় কলকারখানার মালিক, পুঁজিপতি—সমাজ নয়। কিন্তু তবু পুঁজিপতি সমাজের সঙ্গে তার উৎপাদিত পণ্যের সম্পর্কে সম্পর্কিত। তার কারখানায় কার্যরত শ্রমিকদের সঙ্গে কিম্বা অন্য পুঁজিপতিদের সঙ্গে মেশিনপত্র বা কাঁচামাল কেনার সম্বন্ধে সে জড়িত। অর্থাৎ খোদ উৎপাদনটা ব্যক্তিগত কিন্তু তবুও তা সমাজের ওপর নির্ভরশীল। পুঁজিপতি কি উৎপাদন করবে না করবে তা নির্ভর করছে সমাজের চাহিদার ওপর। ক্রেতা নেই তেমন পণ্যের উৎপাদন অর্থহীন। সমাজের জন্যই উৎপাদন। সে কারণে উৎপাদন সবসময়ই সামাজিকভাবে নির্ণীত উৎপাদন। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ক্রিয়াকাণ্ড নয়।

মার্কসের চিন্তাপদ্ধতি বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নামে খ্যাত। অবশ্য মার্কস কখনও নিজের চিন্তা পদ্ধতির ঐ নাম নিজে

সাব্যস্ত করেন নি। সে যাই হোক, কোনো বিষয় সম্পর্কে কিভাবে ভাবতে হয় এবং ভাবনা থেকে কিভাবে সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বের করে আনতে হয় আলোচ্য রচনার কিছু অংশে তিনি সেসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন, উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা বিমূর্তভাবে শুরু হতে পারে না। অর্থাৎ মনগড়া কোনো উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হতে পারে না। সবসময়ই সামাজিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের উৎপাদন নিয়েই আলোচনা করতে হবে। কিম্বা উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা অনুসরণ করতে হবে।

উৎপাদনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক রূপ থেকে উৎপাদনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার কাজ চিন্তার একটি প্রক্রিয়া। আমরা যেমন অনেকগুলো সত্যিকারের পাখি দেখার পর পাখি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা গড়ে তুলি, মার্কস চিন্তার সেই স্বাভাবিক নিয়মকেই এখানে অনুসরণের প্রস্তাব করছেন। তারপর সুনির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থার নির্দিষ্ট লক্ষণগুলো উৎপাদনের সাধারণ লক্ষণ থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা আবশ্যক। টিয়েপাখি কিভাবে অন্যসব পাখি থেকে আলাদা তা টিয়েপাখির নির্দিষ্ট লক্ষণ থেকে বোঝা যাবে। ওই নির্দিষ্ট লক্ষণগুলো টিয়েপাখিকে পাখি নামক সাধারণ ধারণা থেকে আলাদা করে বুঝতে সাহায্য করে। ঠিক তেমনি পুঁজিতন্ত্রের নির্দিষ্ট লক্ষণগুলো উৎপাদন ব্যবস্থার সাধারণ লক্ষণ থেকে আলাদা করে বুঝতে হবে।

সাধারণ লক্ষণ আর নির্দিষ্ট লক্ষণের তফাত মনে না রাখার ফলে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রবিদরা মারাত্মক গলদ করেন। যেমন, সকল উৎপাদন ব্যবস্থাতেই উৎপাদন করতে হলে উৎপাদনের উপায় আর শ্রমের দরকার। অতএব বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রবিদদের ধারণা উৎপাদনের উপায় মানেই পুঁজি। আদিম মানুষের দুহাতই সে কারণে পুঁজি তার অন্য কোনো উৎপাদনের উপায় না থাকলেও। বা পুঁজিতন্ত্রে শ্রম যেভাবে বেচাকেনার পণ্য হিশাবে আবির্ভূত হয় তাদের ধারণা সবদেশে ও সবকালে শ্রমের চরিত্র বুঝি এরকমই। পুঁজিতন্ত্রের নির্দিষ্ট চরিত্র লক্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে এরকম ধারণার জন্ম স্বাভাবিক।

সাধারণ অর্থে উৎপাদন বলে কিছু নেই, উৎপাদন সবসময়ই নির্দিষ্ট উৎপাদন। ঠিক যেমন সাধারণ অর্থে পাখি বলে কিছু নেই, পাখি সবসময়ই ময়না কিম্বা শালিখ কিম্বা টিয়ে—ইত্যাদি। সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো চিন্তা ছেঁকে নেয় নিজের দরকারে। জানার পদ্ধতিটাই এরকম। এটা চিন্তার নিজস্ব প্রক্রিয়া এবং সেকারণে বিমূর্ত। এই

বিমূর্তায়ন অর্থপূর্ণ হতে পারে তখনই যখন কোনো কিছু সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করতে গেলে সেটা আমাদের অনেক কিছু বলা থেকে বাঁচিয়ে দেয়। পুনরাবৃত্তির ক্লান্তি কমায়। শব্দ ও বাক্যের অপচয়ও বন্ধ করে। যেমন পাখি বললে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝি যে, এর ডানা আছে। আকাশে ওড়ে, চঞ্চু আছে, পালক আছে, ইত্যাদি। যদি বলি কাঠঠোকরা একটি পাখি তাহলে কাঠঠোকরাকে বোঝানোর জন্য পাখিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখের আর প্রয়োজন পড়ে না, কেবল তার নির্দিষ্ট চরিত্র লক্ষণের উল্লেখই যথেষ্ট হয়। যেমন, কাঠঠোকরা কাঠ ঠুকরে নিজের জন্য বাসা তৈরি করে। এটা অন্যান্য পাখি করে না।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য আর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের এই তফাত ও সম্পর্ক বুঝিয়ে দেবার পরই মার্কস উৎপাদন ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে মার্কস এখানে সুনির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছেন না। সে দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন "পুঁজি" গ্রন্থে। সেখানে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ছিলো তাঁর আলোচনার বিষয়।

উৎপাদন সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা হচ্ছে সমাজের সদস্য হিশাবে মানুষ নিজেদের দরকারে প্রাকৃতিক বস্তুকে নিজেদের শ্রম দিয়ে প্রয়োজন মাফিক রূপান্তর সাধন করে। এটাই উৎপাদন। উৎপন্ন দ্রব্যে ব্যক্তির শরিকানা নির্ধারণ করে বিতরণ। আর বিতরণের মধ্যে ব্যক্তির ভাগে যা পড়ে তা তার বদলাবার ইচ্ছে থাকলে সে যা চায় তা পাবার জন্য নিজের ভাগ থেকে অন্যকে কিছু দিয়ে অন্যের কাছ থেকে নেবার নাম বিনিময়। আর ভোগ হচ্ছে সেই পর্যায় যেখানে উৎপন্ন দ্রব্যকে ব্যক্তি নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার দরকারে আত্মস্থ করে।

এতে মনে হয় উৎপাদন, বিতরণ, বিনিময় ও ভোগ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু একই সঙ্গে তারা পরস্পর থেকে আলাদা। উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে অনেকেই কেবল উৎপাদনকেই বুঝে থাকেন। যেনবা বিতরণ বিনিময় বা ভোগের সঙ্গে উৎপাদনের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।

এই বিভ্রান্তি মোচনের জন্য মার্কস আলোচ্য রচনায় উৎপাদনকে আলাদা করে আলোচনা করেন নি। তিনি বরং উল্টো স্পষ্ট করেছেন কিভাবে ভোগ, বিতরণ ও বিনিময় আসলে উৎপাদনেরই অন্তর্গত— উৎপাদনেরই এক একটি মুহূর্ত। আমরা এখানে মার্কসের অনুসরণে সেদিকটিই স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করবো।

ভোগ ও উৎপাদন

(ক) এ সম্পর্কে মার্কসের প্রথম সূত্র হচ্ছে ভোগ মানেই উৎপাদন। অর্থাৎ ভোগ বা উৎপাদন প্রথমত একই কথা। উৎপাদনে কাঁচামাল নিঃশেষিত হয়, মেশিনপত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব বলা যায় উৎপাদন-প্রক্রিয়া মেশিনপত্র আর কাঁচামাল ভোগ করছে। আবার আমরা কোনো কিছু খাই পরি বা ব্যবহার করি—অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা যাকে ভোগ বলি সেই অর্থে কোনো কিছু ভোগ করি তাহলে ভোগের এই প্রক্রিয়া একই সঙ্গে উৎপাদনও বটে। কারণ এতে আমরা নিজেদের শরীর উৎপাদন করছি। ভোগ থেকে আমাদের প্রাণ নিজের জীবনীশক্তি আহরণ করে। ভোগ ছাড়া আমরা উৎপাদিত হতে পারি না। তাহলে এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে ভোগ আর উৎপাদন একই কথা।

তবু ভোগ আর উৎপাদনের এই দুটো দিককে দু'ভাবে চিহ্নিত করা দরকার। প্রথম ধরনের ভোগ হচ্ছে উৎপাদনমূলক (Productive Consumption)। এই ভোগ বৈষয়িক। দ্বিতীয় ধরনের ভোগ হচ্ছে ব্যক্তিগত ভোগ অর্থাৎ আসল ভোগ। এই ভোগের মধ্যে প্রায় কেউই উৎপাদনের দিকটা লক্ষ করে না। অতএব ধরে নেয়া হয় যে ভোগ আগাগোড়াই অনুৎপাদনমূলক, এবং লক্ষ্যই হচ্ছে ভোগ্য সামগ্রীর ধ্বংস সাধন করা। দ্বিতীয় ধরনের ভোগকে মার্কস চিহ্নিত করেছেন ভোগমূলক উৎপাদন হিশাবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবন থেকে মার্কস পরবর্তীকালে আরো দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত টেনেছেন তাঁর "পুঁজি" গ্রন্থে। একটি হচ্ছে সমাজের উৎপাদন-কর্মকাণ্ডকে দুটো বিভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত। যে বিভাগে ভোগ কেবল উৎপাদন সরঞ্জাম বা উপকরণ তৈরির জন্যই সম্পন্ন হয় সে বিভাগের নাম তিনি দিয়েছেন উৎপাদনের উপায় উৎপাদন বিভাগ। এর অন্য নাম এক নম্বর বিভাগ। আর দুই নম্বর বিভাগ হচ্ছে ভোগ্য বস্তু উৎপাদনের বিভাগ। এই বিভাগের উৎপাদন স্রেফ ভোগের জন্য। সামাজিক উৎপাদনকে এই দুই বিভাগে ভাগ করে মার্কস উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন সাধন করে সমাজ কী করে টিকে থাকে তা চমৎকারভাবে দেখাতে পেরেছেন "পুঁজি" দ্বিতীয় খণ্ডে। তাঁর

দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত ছিলো স্থিরমূল্য পুঁজি (Constant Capital) আর মূল্যোৎপাদক পুঁজির (Variable Capital) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার সিদ্ধান্ত। এ বিষয়গুলো আমরা কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে রাখছি।

(খ) ভোগ ও উৎপাদন সম্পর্কে মার্কসের দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে ভোগ ও উৎপাদন পরস্পরের প্রযোজক। একটির ওপর আরেকটি নির্ভরশীল।

ভোগ কিভাবে উৎপাদনের প্রযোজনা সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে আগে আলোচনা করা যাক।

(১) ভোগ উৎপন্ন বস্তুকে সত্যিকারের উৎপন্ন বস্তু করে তোলে। আমার যদি কোনো পোশাক থাকে কিন্তু সে পোশাক আমি যদি কখনো না পরি তাহলে সে পোশাক সত্যিকারের পোশাক হয়ে ওঠে নি বলতে হবে। যে বাড়িতে কেউ থাকে না, যে বাড়ির ব্যবহার নেই, সেই বাড়ি সত্যিকারের বাড়ি নয়। যে রেলওয়ের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি চলে না সেটা রেলওয়েই নয়। বড় জোর বলা যেতে পারে সেটা "সম্ভাব্য" রেলওয়ে। এই সম্ভাব্যতা সত্যি করে তোলার মধ্য দিয়ে ভোগ উৎপাদনের প্রযোজক হিশাবে নিজের ভূমিকা পালন করে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদন কর্মকাণ্ডের মূর্তায়িত রূপ বলেই উৎপন্ন দ্রব্য হয়ে ওঠে না, বরং কোনো না কোনো সক্রিয় ভোগীর ব্যবহারে লাগে বলেই তা উৎপন্ন।

(২) ভোগ উৎপাদনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিশাবে বিরাজ করে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত কারণ হিশাবে ভোগ সবসময়ই উপস্থিত থেকে উৎপাদনকে সক্রিয় রাখে বলেই ভোগ উৎপাদনের প্রযোজক।

(৩) ভোগ উৎপাদনকে পরিসমাপ্তি দেয়। উৎপন্ন দ্রব্যকে তার "শেষ আঁচড়" (Last Finish) দেয় ভোগ। এবং এভাবে উৎপাদনের পরিসমাপ্তি টেনে নতুন উৎপাদনের দরকারটা তৈরি করে ভোগ। উৎপন্ন দ্রব্যের বৈষয়িক রূপের নিরাকার সাধন করে ভোগ উৎপাদনকে সম্পূর্ণতা দান করে। এ কারণেও ভোগ উৎপাদনের প্রযোজক।

(৪) নতুন উৎপাদনের দরকারটাকে বারবার তৈরি করার মধ্য দিয়ে উৎপাদনের সক্রিয়তাকেও সচল রাখে ভোগ। উৎপাদনের গতিশীলতা বহাল রাখার কারণেও ভোগ উৎপাদনের প্রযোজক।

(৫) ভোগ পুনরুৎপাদনেরও কারণ। সে কারণেও উৎপাদনের প্রযোজক।

(৬) উৎপাদনকে পরিসমাপ্তি ও পূর্ণাঙ্গতা দেয়ার মধ্য দিয়ে ভোগ উৎপাদন বহাল রাখার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের জন্য উৎপাদককেও তৈরি করে। উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন বারবার চলতে থাকে বলেই উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ে, নতুন কৃৎকৌশলের আবিষ্কার হয়। এদিক থেকেও ভোগ উৎপাদনের প্রযোজক।

উৎপাদন কিভাবে ভোগের প্রযোজক এবার তা আলোচনা করা যাক।

(১) ভোগের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করে উৎপাদন, সে কারণে উৎপাদন ভোগকেও প্রযোজিত করে।

(২) ভোগের নির্দিষ্টতা দান করে উৎপাদন। ভোগের রূপও নির্ধারণ করে দেয় উৎপাদনই। কারণ ভোগ্য বস্তু বিমূর্ত কোনো বস্তু নয়। নির্দিষ্ট রূপের একটা বস্তু। অতএব এই নির্দিষ্ট বস্তুর রূপ ভোগকেও একটা নির্দিষ্ট রূপ দান করে। সব ক্ষুধাই ক্ষুধা। কিন্তু কিছু ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটে কাঁচা মাংসে। কিছু ক্ষুধার নিবৃত্তি কাঁটাচামচ হাতে সুস্বাদু মাংসে। ভোগের রূপেও এই দুই তারতম্য আনে উৎপাদন। ভোগকে উৎপাদন এভাবে নির্দিষ্ট রূপ দান করে বলে উৎপাদন ভোগের প্রযোজক।

(৩) ভোগের জন্য উৎপাদন কেবল ভোগের বিষয় হিশাবে উৎপন্ন দ্রব্যকেই সরবরাহ করে না, সে দ্রব্যের জন্য আকাঙ্ক্ষাও সরবরাহ করে। ভোগের মাত্রা (পরিমাণগত ও গুণগত) ইতিহাসের সব পর্যায়ে এক রকম থাকে না। সমাজের বিকাশ মানে ভোগের নিত্যনতুন ধরনেরও বিকাশ। অতএব নিত্যনতুন আঙ্ক্ষারও বিকাশ। প্রাকৃতিক স্থূলতা ও বর্বরতা থেকে ভোগের বিবর্তন ও বিকাশ মানুষের নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম না হলে সম্ভবপর হয়ে উঠতো না। উৎপাদন এই নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয় এবং একারণেও ভোগের প্রযোজক।

বিতরণ ও উৎপাদন

উৎপাদন শেষ হবার পর উৎপন্ন বস্তুর সঙ্গে উৎপাদকের সম্পর্ক কী হবে তা নির্ভর করে উৎপাদকের সঙ্গে সমাজের অন্য সদস্যদের সম্পর্কের ওপর। উৎপাদক আপনা-আপনি উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকার লাভ করে না এবং উৎপন্ন সামগ্রীর ভোগও সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে যায় না। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে বিতরণ। উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের মাঝখানে বিতরণ সামাজিক কানুন ও রীতি মাফিক কার্যকর থাকে।

ক. উৎপাদন বিতরণ রূপকে নির্ধারণ করে

অর্থশাস্ত্রে বিতরণ নিয়ে দু'বার আলোচনা হয়। এটা বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের রীতি। একবার আলোচনা হয় শ্রম, পুঁজি আর জমির বিতরণ নিয়ে অর্থাৎ একবার উৎপাদনের উপকরণ আর এজেন্টদের নিয়ে, আরেকবার মজুরি, মুনাফা আর খাজনা নিয়ে। অর্থাৎ দ্বিতীয়বারে আলোচনা হয় আয়ের বিশেষ রূপ বা বিতরণেরই বিশেষ রূপ নিয়ে। যেটা এখানে মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে উৎপাদনের রূপ বিতরণের নির্দিষ্ট রূপের নির্ধারক। একজন ব্যক্তি যদি মজুরি শ্রমিক হিশাবে অংশগ্রহণ করে তাহলে উৎপন্ন সম্পদে তার অংশটাও সে পায় মজুরি হিশাবে। ঠিক তেমনি পুঁজিপতি তার অংশ পায় মুনাফায় আর ভূমি মালিক খাজনায়। কিন্তু উৎপাদনে শ্রমিক, পুঁজিপতি ও ভূমি মালিক হিশাবে অংশগ্রহণ উৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষ একটি রূপকেই বোঝায় এবং তা হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিতরণের রূপও পুঁজিতান্ত্রিক। উৎপাদন ব্যবস্থায় বিতরণের রূপই বিতরণের এই সব ধরণকে নির্ধারিত করে দেয়।

খ. বিতরণ উৎপাদনের শর্ত নির্ধারণ করে

গতানুগতিক ধারণা হচ্ছে যে, বিতরণ উৎপাদনের পরে ঘটে। কিন্তু এটা খুবই একদেশদর্শী ধারণা। এ ধারণাটা প্রাধান্য পাবার আসল কারণ হচ্ছে বিতরণ বলতে প্রায় সবসময়ই উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণ বোঝানো হয়। কিন্তু একটি দ্রব্য উৎপাদিত হবার আগে সে দ্রব্য উৎপাদনের যাবতীয় শর্তগুলো বিতরণ করা দরকার।

অর্থাৎ জমি, মেশিনপত্র, উৎপাদনের কাঁচামাল প্রভৃতির বিতরণ সম্পন্ন না হলে উৎপাদন শুরু করার প্রশ্নই ওঠে না। তারপর রয়েছে প্রয়োজনীয় শ্রমের বিতরণ। উৎপাদন শুরু করার আগে কোন শ্রম কোন কাজে ব্যবহার হবে সেটা নির্ধারিত হয়ে থাকতে হয়। শ্রম ও উৎপাদনের উপায়ের বিতরণ সম্পন্ন হবার পরই কেবল উৎপাদন সংঘটিত হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিতরণ উৎপাদনের শর্ত তৈরি করে। একারণে রিকার্ডো মনে করতেন বিতরণই অর্থ-শাস্ত্রের আসল বিষয়।

বিতরণ কিভাবে উৎপাদনের চরিত্র নির্ণয় করে তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন মার্কস। একটি জাতি যখন অন্য একটি জাতিকে যুদ্ধে পদানত করে তখন পরাজিতদের জমি ও সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে তাঁরা বিতরণ করে নেয়। এটা করতে গিয়ে বিতরণের বিশেষ এক রূপ আর সম্পত্তির ধরন তারা আরোপ করে। এতে উৎপাদনের রূপও নির্ণীত হয়ে যায়। পরাজিতদের দাসে পরিণত করে ফেলতে পারে বিজয়ীরা। সেক্ষেত্রে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি দাঁড়ায় দাস শ্রম।

অনেক সময় জনগণ বৈপ্লবিক উত্থান ঘটিয়ে বিশাল ভূসম্পত্তিগুলোকে ছোট ছোট ভূখণ্ডে ভাগ করে নেয়। এই নতুন ভাগবাঁটোয়ারা উৎপাদনের চরিত্রে নতুনত্ব দান করে। কিম্বা কোনো জাতি আইন করে জমিজমা বিশেষ কিছু পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে উৎপাদনে নতুন সম্পর্কের প্রবর্তন ঘটায়। ভারতবর্ষে শ্রমকে বংশের উত্তরাধিকার হিশাবে বিতরণ করে রাখার কারণে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়েছে।

তবুও মার্কস যুক্তি দেখিয়েছেন এসব ক্ষেত্রে শেষাবধি নির্ধারক হচ্ছে উৎপাদন। কারণ পরাজিত জাতির সহায়সম্পত্তি জমিজমা প্রভৃতির বিতরণ নির্ধারিত হয় জয়ী জাতির উৎপাদন ব্যবস্থার ধর্মানুযায়ী। যেমন, লুণ্ঠনের ওপর একটি জনগোষ্ঠী বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু লুণ্ঠনকে সম্ভব করে তুলতে হলে দরকার হয়, লুণ্ঠনযোগ্য বস্তুর উপস্থিতি। লুণ্ঠনের পদ্ধতিও উৎপাদন পদ্ধতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়। একজন দাসকে চুরি করা মানে উৎপাদনের যন্ত্র চুরি করা। কিন্তু যে জাতি দাস চুরি করে তার উৎপাদন ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যা দাস শ্রমের উপযোগী।

বিনিময় ও উৎপাদন

বিনিময় তিনভাবে উৎপাদনের অন্তর্গত।

(১) উৎপাদন কর্মকাণ্ডের মধ্যে তৎপরতা ও দক্ষতার বিনিময়।

(২) উৎপন্ন বস্তুর পূর্ণতা দান এবং তাকে ভোগোপযোগী করে তোলার বিনিময়।

(৩) মজুতদারের সঙ্গে মজুতদারের কিম্বা খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিনিময়।

বিনিময় উৎপাদন থেকে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন পর্যায় হিশাবে আবির্ভূত হয় শুধুমাত্র শেষ পর্যায়ে যখন উৎপন্ন বস্তুর বিনিময় সাধিত হয় সরাসরি ভোগের প্রয়োজনে। অর্থাৎ মার্কস ভোগের জন্য সাধিত বিনিময় ছাড়া অন্যসকল বিনিময়কে উৎপাদন কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হিশাবে গণ্য করছেন। উৎপাদন পদ্ধতি বিচারের এই গুরুত্বপূর্ণ দিক খেয়াল রাখা খুবই জরুরি।

বিনিময়ের একটি কারণ হচ্ছে শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগ না থাকলে বিনিময়েরও দরকার থাকতো না। অন্যদিকে ব্যক্তিগত বিনিময় যদি কোনো সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির অন্যতম চরিত্রলক্ষণ হয় তাহলে বুঝতে হবে সে সমাজের উৎপাদন কর্মকাণ্ডও সংঘটিত হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাবে।

এছাড়া শহর ও গ্রামের মধ্যকার বিনিময়, গ্রামের বা শহরের অভ্যন্তরে বিনিময় প্রভৃতির তীব্রতা, ব্যাপ্তি ও পদ্ধতি উৎপাদনের বিকাশ ও বিন্যাস কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

বিতরণ, বিনিময় ও ভোগকে উৎপাদনেরই অন্তর্গত মুহূর্ত হিশাবে দেখিয়েছেন মার্কস। কিন্তু শেষে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই দেখানোটা তাদের অভিন্নতা প্রমাণ করার জন্য নয়। আসলে সবসময়ই খেয়াল রাখতে হবে উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে সামগ্রিক ভাবে এইসব সকল মুহূর্তের সকল কিছুর ঐক্য বোঝায়। কিন্তু তাই বলে তাদের ভিন্নতা গুলিয়ে ফেলা চলবে না। সমগ্রতার মধ্যে উৎপাদন, বিতরণ, বিনিময় ও ভোগ নিজ নিজ ভিন্নতা নিয়ে বিরাজ করে।

উৎপাদন প্রক্রিয়া

আমরা লক্ষ করেছি খোদ উৎপাদন সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে মার্কস সরাসরি কিছু বলেন নি। মার্কস এখানে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা

সামগ্রিক ধারণা দিতে চেয়েছেন। সাধারণতঃ আমরা প্রায়ই একটা ভুল করি। উৎপাদন ব্যবস্থা বললে মার্কসের বর্ণিত সামগ্রিকতাকে আমরা বুঝি না। যেভাবে একটি বস্তু তৈরি হয় সেই খোদ উৎপাদনের পদ্ধতিকে আমরা উৎপাদনব্যবস্থা হিশাবে ধরে নিই। অর্থাৎ বিতরণ, বিনিময় ও ভোগও যে উৎপাদনব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, যে মুহূর্তকে না জানলে বা না বুঝলে একটি দেশের বা সমাজের আসল রহস্যই অজ্ঞাত থেকে যায়, সে বিষয়ে আমাদের কোনো সচেতনতা নেই বললেই চলে। মার্কসের এই নিবন্ধটির সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে উপরিউক্ত মারাত্মক ভুলের হাত থেকে নিবন্ধটি মুক্তি পেতে আমাদের সাহায্য করে।

উৎপাদন বলতে আমরা বুঝি উৎপাদনের উপায় ও উপকরণের সাহায্যে কাঁচামাল বা বস্তুর যে রূপান্তর শ্রম সাধন করে সেটাই হচ্ছে উৎপাদন। মার্কস সেটাকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সেটা উৎপাদনব্যবস্থার একটা দিক মাত্র এবং সে বিষয়ে তিনি "পুঁজি" প্রথম খণ্ডে আলোচনা করেছেন শ্রমপ্রক্রিয়া শিরোনামে। আমরা যখন বলি একটি সমাজের চরিত্র তার উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা নির্ণীত তখন এতে কেবল এটাই বোঝায় না যে, সে সমাজে ধান, লাঙল, কাপড় ইত্যাদি যে শ্রমপ্রক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে সেই শ্রমপ্রক্রিয়াই সে সমাজের চরিত্র নির্ধারণ করে। সেটা একটা দিক এবং সে দিকটি প্রধান নাও হতে পারে। যেমন, যে সমাজে এখনো উৎপাদন শুরুই হয় নি, যারা এখনো শিকার ও ফলমূলের ওপর জীবন ধারণ করে তাদের আমরা বুঝবো কিভাবে? নিশ্চয়ই বিতরণ ও ভোগের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে। আবার অনেক সমাজের চরিত্র বিতরণ ও বিনিময়ের চরিত্র দ্বারা প্রধানভাবে নির্ণীত। যেমন, বাংলাদেশ। উৎপাদনের পদ্ধতি এখানে এখনো বিকশিত নয়, কিন্তু বিনিময় ও বিতরণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে এই দেশ জড়িত। এই সমাজের গতিপ্রকৃতি আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত। দেখা যাচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ ধারণা থাকলে একটি সমাজকে বোঝার ধারণাও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। যতোই আমরা উৎপাদন-ব্যবস্থাই সমাজচরিত্রের নির্ণায়ক এই মতের পক্ষে বলে নিজেদের জাহির করি না কেন মার্কস উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে কী বুঝতেন সেটা না জানলে আমাদের অবস্থান শেষাবধি গিয়ে দাঁড়ায় মার্কসের শত্রুদের দলে, মুখে আমাদের যতোই বিপ্লবীপনা থাকুক।

পণ্য ঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ ব্যক্তি

মার্কসের কতিপয় মৌলিক ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা লক্ষ করেছি যাঁরা আমাদের দেশে নিজেদের মার্কসবাদী বলেন তাঁদের অধিকাংশই মার্কসের মৌলিক ধারণার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত নন। আসলে মার্কসের বিশালাকার গ্রন্থগুলো দেখে খুব আত্মপ্রত্যয়ী বিপ্লবীরও মনে ভীতি আসে। এ কারণে যে, এগুলো পাঠ করা আসলেই কঠিন ব্যাপার। এর ফল হয়েছে খুবই খারাপ। নোটবই পড়ে পরীক্ষা পাশ করার একটা রেওয়াজ আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে। তেমনি বোধ হয় মার্কসের ওপর অন্যের লেখা নোটবই পড়ে বিপ্লবী তত্ত্ব নির্মাণের রেওয়াজটা গেঁড়ে বসেছে আমাদের বিদ্যাচর্চার মধ্যে।

আসলে বিপ্লবী তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের সংযোগটা থাকা চাই সরাসরি। বাঁকাভাবে, অন্যের মাধ্যমে নয়।

সত্যি বলতে কি, বিপ্লবীদের একটা কর্তব্য হচ্ছে নিজ নিজ দেশের অবস্থা বিবেচনা করে মার্কসের চিন্তার একটা সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। এটা লেনিন ভীষণ জোর দিয়ে বলেছিলেন, বিখ্যাত 'ইস্ক্রা' পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। রুশ দেশের অবস্থানকে সামনে রেখে মার্কসীয় চিন্তার সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যার জন্যই লেনিন সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। এ সত্য আজ আর কারো অজানা নয়।

পাঠশালাতে মার্কসের ওপর আমাদের ক্লাশ সেই লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থাৎ মার্কসকে সরাসরি জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করা। আমরা বারবার বলেছি এবং ভবিষ্যতে আরো অনেকবারই বলবো যে, পাঠশালায় আমরা যা পড়ছি, তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ না দিলে মার্কসের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কাজের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং কৌশল সম্পর্কে কোনো ধারণাই জন্মাবে না।

যেসব ধারণা নিয়ে আগেই আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো নিয়েই এবারকার নোট। আলোচনা শুরু করার আগে, মার্কস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা আর নোটবই মানসিকতার একটা উদাহরণ দিই।

মার্কস শ্রেণীসংগ্রাম আবিষ্কার করেন নি

বোধহয় নিরানব্বই দশমিক নয়ভাগ মার্কসবাদীর ধারণা শ্রেণীসংগ্রাম মার্কসের আবিষ্কার। তাঁর চিন্তার সবকিছুই বুঝিবা 'শ্রেণীসংগ্রাম'। সে কারণে নিজেদের মার্কসবাদী প্রমাণ করবার জন্য দেখা যায় কথায় কথায় শ্রেণীসংগ্রাম- শ্রেণীসংগ্রাম' বলে অনেকের মুখে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া মার্কসের অন্য কোনো মৌলিক ধারণা সম্পর্কে তারা কোনো খোঁজ খবরই রাখেন না।

আসলে সমাজ যখন শ্রেণী-বিভক্ত হয়ে যায় তখন শ্রেণীসংগ্রাম যে অনিবার্য এটা মার্কসের আগেই সমাজবিদ বা অর্থনীতিবিদদের জানা ছিলো। এ বিষয়ে মার্কসের নিজের বক্তব্যই শোনা যাক। ১৮৫২ সালের মার্চ মাসের ৫ তারিখে ভেদেমেআরকে লিখা একটি চিঠিতে মার্কস লিখছেন ঃ

> "আধুনিক সমাজের মধ্যে শ্রেণী আবিষ্কার করার পেছনে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এমনকি তাদের মধ্যকার সংগ্রামও না। আমার বহু আগে বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরাই শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ বর্ণনা করে গিয়েছে। আর বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা করে গিয়েছে শ্রেণীর অর্থনৈতিক অঙ্গব্যবচ্ছেদ। আমি নতুন যা করেছি তা হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, (১) উৎপাদন বিকাশের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গেই কেবল শ্রেণীর অস্তিত্ব জড়িত, (২) শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্যভাবে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়, (৩) এই একনায়কতন্ত্র সকল শ্রেণীর বিলুপ্তি ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে যাবার পথে একটি রূপান্তরশীল পর্যায় মাত্র।"

আজ আমরা মার্কসের একটি প্রাথমিক– কিন্তু প্রধান ধারণা নিয়ে আলোচনা করবো। সেটি হচ্ছে–পণ্য।

শুরুর শুরু ঃ পণ্য

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ শুরু করার আগে মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থে পণ্য নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। আমরা অনেকেই জানি যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণমূলক ব্যাখ্যা হিশাবে তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব। মার্কস কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশ্লেষণ দিয়ে তাঁর আলোচনা শুরু করেন নি। শুরু করেছিলেন পণ্য দিয়ে।

পণ্য দিয়ে আলোচনা শুরু করার পক্ষে মার্কসের যুক্তি হচ্ছে যেসব সমাজে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা বহাল রয়েছে সেসব সমাজের সম্পদ হাজির থাকে 'বিপুল সংখ্যক পণ্যের' রূপ নিয়ে। একটি পণ্য সেক্ষেত্রে সম্পদের প্রাথমিক রূপ। অতএব পুঁজি বা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ শুরু হওয়া দরকার পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়ে। লক্ষণীয় যে, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র কখনোই পণ্য নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। চাহিদা ও সরবরাহ কিংবা সরাসরি উৎপাদন থেকে শুরু হয় বিশ্লেষণ। অর্থাৎ ধরে নেয়া হয় যে, পণ্যের রহস্য বুঝিবা খুবই স্পষ্ট। আসলে পণ্যের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত রূপ যে খচিত রয়েছে সেটা বুর্জোয়া শাস্ত্রবিদদের চোখে পড়ে না।

মার্কসের অর্থশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে পণ্যসংক্রান্ত বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পদের বিশ্লেষণের ভিত্তিই কেবল খচিত নয়, বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিও খচিত। যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে অন্যান্য সামাজিক অবয়ব, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

পণ্যের দুই ধর্ম ঃ উপযোগিতা ও বিনিময়তা

পণ্য সম্পর্কে মার্কসের প্রথম ভাষ্য হচ্ছে, পণ্য আমাদের বাইরে থাকে। পণ্য "বাইরের জিনিস"। এমন একটা জিনিস যা আমাদের যেকোনো ধরনের প্রয়োজন মেটায়। এই প্রয়োজন হতে পারে ক্ষুধার, বুদ্ধির কিংবা আবেগের। কোন প্রয়োজন পণ্য মেটাচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পণ্য তার নিজের প্রাকৃতিক গুণের কারণে সে প্রয়োজন মেটাতে পারে।

ভাত আমাদের ক্ষুধা মেটায়, মার্কসের বই 'পুঁজি' আমাদের বুদ্ধির প্রয়োজন মেটায়। কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষের আত্মার প্রয়োজন মেটায় ধর্মগ্রন্থ, কিম্বা কোনো গায়কের গান আমাদের নান্দনিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে, ইত্যাদি। সব ক্ষেত্রে—ভাত, মার্কসের 'পুঁজিগ্রন্থ', ধর্মগ্রন্থ, গান, পণ্য হবার একটা শর্ত পালন করছে। তা হচ্ছে, তারা প্রত্যেকে বাইরের জিনিস, এবং নিজেদের প্রাকৃতিক গুণের কারণে আমাদের কোনো না কোনো প্রয়োজন মেটাতে পারে।

উপরের উদাহরণে সবই কেবল সরাসরি ভোগের জন্য পণ্যের উদাহরণ দেয়া হলো। পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনও মেটাতে পারে।

অর্থাৎ সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে যা কিছু আমাদের প্রয়োজনে লাগে সেসবের প্রত্যেকটির পণ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহলে পণ্যের একটা ধর্ম বোঝা গেলো কোনো জিনিসের পণ্য হতে হলে তার উপযোগিতা থাকা চাই।

কিন্তু মার্কস পণ্যকে বাইরের জিনিস বলছেন কেন? এটা কি তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন নাকি এর কোনো তাৎপর্য আছে?

আমাদের বাইরে যা বিরাজ করে তা হচ্ছে প্রকৃতির-'বাইরের জিনিস।' আমাদের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনের জন্য প্রকৃতিকে আমরা আত্মস্থ করি। মানুষ ও প্রকৃতির এই প্রাকৃতিক দ্বিখণ্ডীভবনের কারণে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা সম্পর্ক সবসময়ই রচনা করতে হয়। সে সম্পর্কের রূপ ইতিহাসের সব পর্যায়ে একরকম থাকে না। এই সম্পর্ক রূপান্তরশীল। এই সম্পর্কের রূপকে অনুধাবন করার ইঙ্গিত আছে মার্কসের কথায়। আসলে 'পুঁজি'-গ্রন্থ অর্থনীতির বই নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বিচার এই গ্রন্থের একটি অন্যতম লক্ষ্য। অতএব বাইরের জিনিস প্রকৃতির যেকোনো কিছুরই যখন কোনো উপযোগিতা দেখা যায় সেটারই তখন পণ্য হয়ে উঠতে পারার সম্ভাবনা থাকে।

এই উপযোগিতা পণ্যের প্রাকৃতিক গুণের কারণে। লোহার উপযোগিতা লোহার গুণে, মেশিনের উপযোগিতা মেশিনের ব্যবহারে, নান্দনিক পণ্যের উপযোগিতা আমাদের নান্দনিক তৃষ্ণা মেটানোর কারণে ইত্যাদি।

কিন্তু উপযোগিতাই কোনো জিনিসের পণ্য হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট নয়। পণ্যের বিনিময়তা-গুণও থাকা চাই। প্রতিটি পণ্যই কোনো না কোনো মূল্যে বিনিময়যোগ্য হতে হবে। পণ্যের এই বিনিময়-যোগ্যতার আবির্ভাব ঘটে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের মধ্যে। বিনিময়তা-গুণের কারণেই পণ্যের বিনিময় ও সঞ্চালন সম্ভব হয়।

অর্থাৎ পণ্যের দুটো দিক বা দুটো ধর্ম। এক হচ্ছে পণ্যের উপযোগিতা, মার্কস একে নাম দিয়েছেন উপযোগিতা-মূল্য। আর দুই, বিনিময়-মূল্য।

বিনিময় ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি

প্রাকৃতিক জিনিস মানুষ বিনিময় কেন করে? এর সোজা একটা উত্তর হচ্ছে প্রয়োজন মেটাবার জন্য। পণ্যের উপযোগিতা মূল্যের দিক থেকে

প্রশ্নটার একটা উত্তর দেয়া গেলো। কিন্তু এ উত্তর যথেষ্ট নয়।

বিনিময় মানে কোনো কিছুর পরিবর্তে অন্য কিছু দেয়া। সেটা হতে পারে অন্য কোনো জিনিস, কিংবা টাকা। এখন, আমাদের যখন কোনো কিছুর প্রয়োজন তখন আমরা তা টাকা না দিয়ে সোজা নিয়ে নিলেই পারি। অন্য সকল প্রাণী বা পাখি তো পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করে না। মানুষ কেন করে?

এর কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমরা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেই স্বীকার করি। প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক জিনিসপত্রের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমাদের প্রয়োজন থাকলেও অন্যের জিনিস আমরা নিয়ে নিতে পারি না। কারো গাছে ফল আছে, খাবার লোক নেই, কিন্তু সেটা আমরা ইচ্ছে করলেই পাবো না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রধানতম দিক বিনিময়-সম্পর্কের মধ্যে বিধৃত। সেটা সম্পত্তির সম্পর্ক। আসলে ওপরের দুটো সম্পর্কই এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কে পর্যবসিত। প্রকৃতি আর আগের মতো সবার জন্য উন্মুক্ত নেই। পাখি বা পশু যেমন করে প্রয়োজন বোধে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করতে পারে মানুষ তেমন করে প্রকৃতিকে আত্মস্থ করতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পণ্য আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভিব্যক্তি। পণ্যের এই দিকটি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পণ্য ও ব্যক্তি

ব্যক্তির উদ্ভব ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের মধ্যে। পণ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেভাবে অভিব্যক্ত, ব্যক্তিও সেভাবে অভিব্যক্ত। আমরা যখন কোনো পণ্য কিনি তখন পণ্য বিক্রেতাকে পণ্যের দাম দেবার মধ্য দিয়ে পণ্যেরই কেবল স্বীকৃতি দিই না, ব্যক্তি হিশাবে সে যে পণ্যটির মালিক তার মধ্যে সেই ব্যক্তিকেও আমরা স্বীকৃতি দিই। পণ্যের আবির্ভাব ও বিকাশ সেকারণে ব্যক্তির আবির্ভাব ও বিকাশও বটে। সমাজের উৎপাদন যতবেশি পণ্য উৎপাদন হিশাবে আবির্ভূত হয়, ব্যক্তির উত্থানও আমরা সেই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করি। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা সে কারণে ব্যক্তিতান্ত্রিক ব্যবস্থা —বুর্জোয়া ব্যবস্থা।

পণ্য সম্পর্কে এই সাধারণ ধারণাগুলো মনে রাখলে এসব বিষয়ে অন্যান্য আলোচনা অনুধাবন সহজ হবে।

শ্রেণী "এখানে এসে পাণ্ডুলিপি থেমে গিয়েছে"

শ্রেণী, শ্রেণীস্বার্থ, শ্রেণীচেতনা– প্রভৃতি শব্দ আমরা হরহামেশা ব্যবহার করি। আমরা ধরে নাই যে শব্দগুলোর অন্তর্গত ধারণা আমাদের আয়ত্তে। অর্থাৎ আমরা বুঝি বা জানি যে শ্রেণী বলতে কী বোঝায়? শব্দগুলোর তাৎপর্য অনুধাবনের জটিলতায় আমরা কখনো থমকে দাঁড়াই না। আমাদের প্রায় সবারই ধারণা শব্দগুলো এতো সহজ যে, ওগুলো দিয়ে কী বোঝানো হয় বা কী বোঝানো উচিত সেসব আমাদের জানা।

আমরা প্রায়ই বলি 'অমুক' বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রায় একশ ভাগ ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই যে, আলোচ্য 'অমুক' একজন সম্পত্তিবান ব্যক্তি বা ধনী। ধনের মালিকানা তার বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার চিহ্ন। তাহলে আমরা অনায়াসেই বলতে পারতাম 'অমুক ধনী ব্যক্তিদের অন্তর্গত'। অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী আর ধনী আমরা সবসময়ই সমার্থে ব্যবহার করি। কিন্তু তবুও অমুক বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত বলার মধ্যে আমরা অমুকের ধনশীলতা ছাড়াও আরো যেনো কিছু বলতে চাই। আসলে বুর্জোয়া শ্রেণী আর ধনী শব্দ দুটো যে সমার্থবাচক নয় এটা আমরা একটু সচেতন থাকলে টের পাই, কিন্তু কোথায় তাদের পার্থক্য সেটা প্রায়ই আমাদের তলিয়ে দেখার অবসর হয় না। ফলে এই শব্দগুলোর ব্যবহার সবসময়ই অর্থহীনভাবে ঘটে। এক ধরনের রাজনৈতিক ইঁচড়েপাকামো বা বামপন্থী পণ্ডিতিপনা জাহির করার জন্য আমরা যত্রতত্র শব্দগুলো ব্যবহার করি।

অথচ 'শ্রেণী' শব্দটি অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ। এর এলোপাথাড়ি ব্যবহার আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে।

তদুপরি শব্দটি জটিল। এমনকি মার্কসীয় চিন্তাধারার মধ্যেও এর জটিলতার খুব একটা সুরাহা হয় নি। সেসব জটিলতা নিয়ে এখানে আমাদের আলোচনা।

প্রথমে একটা তথ্য দিয়ে শুরু করি। শ্রেণীসংগ্রাম মার্কসের আবিষ্কার নয়। আমরা যেহেতু অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার থেকে মুখস্থ করেছি যে, "অতীতে বিরাজমান সকল সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস"—আমরা ধরে নিয়েছি, শ্রেণী বা শ্রেণীসংগ্রাম মার্কসেরই প্রযোজনা। এ ধারণা আমাদের আরো বদ্ধমূল হয়েছে যখন আমরা জেনেছি যে, মার্কসীয় বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামে। কারণ ইতিহাসের উত্থানপতনকে এই বিজ্ঞান শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে।

কিন্তু মার্কস নিজেই বলেছেন যে, শ্রেণীসংগ্রাম তাঁর নিজের আবিষ্কার নয়। তাঁর আগেই ইতিহাসবিদগণ শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব নিয়ে লিখেছেন। তাঁর আবিষ্কার কেবল অতোটুকুই যে, তিনি শ্রেণীসংগ্রামের শেষ ফল কী দাঁড়াবে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এই তথ্যের পর আমরা শ্রেণী শব্দটি বুঝবার ক্ষেত্রে কতিপয় জটিলতা নিয়ে আলোচনা করবো।

বিভিন্ন সময়ে মার্কস নিজে

মার্কস তাঁর রচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণী শব্দটির একই রকম ব্যবহার বজায় রাখেন নি। 'জর্মান ভাবাদর্শ' (১৮৪৫-৪৬) গ্রন্থে শ্রেণীর ব্যবহার এসেছে এক শ্রেণীর ওপর আরেক শ্রেণীর আধিপত্য বুঝবার দরকারে, ক্ষমতা দিয়ে শ্রেণী-পার্থক্য বুঝাবার প্রয়াস এসময় লক্ষ করা যায়। যেমন, ক্ষমতাবান শ্রেণী বা ক্ষমতাহীন শ্রেণী, ইত্যাদি। অন্যদিকে, প্রচ্ছন্নভাবে, শ্রেণী কী করে হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে তাঁর খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনগুলোও এসময়েই দানা বাঁধে। কিন্তু শেষাবধি সেসব অনুধাবনের কোনো মূর্ত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ তাঁর হাতে লাভ করে নি। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

কিন্তু যে ক্ষমতা দিয়ে শ্রেণী চিহ্নিত করণ 'জর্মান ভাবাদর্শে' দ্রষ্টব্য সে ক্ষমতা মূলতঃ সামন্তীয় ক্ষমতা বিন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়। যেমন, সামন্তপ্রভুর আধিপত্য, ভূমিদাসের ক্ষমতাহীনতা, ইত্যাদি। অর্থাৎ মার্কস তখনো সামন্ত সমাজের ক্ষমতাবিন্যাস আর আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণী বিভাজনের প্রক্রিয়ার মধ্যে তফাত করা শুরু করেন নি।

'দর্শনের দারিদ্র্য' (১৮৪৭) গ্রন্থে শ্রেণী-সংক্রান্ত ধারণার আরো বিকাশ লক্ষ করা যায়। এ বিষয় নিয়ে তিনি ভাবনা শুরু করেছেন স্পষ্ট

বোঝা যায়। সামন্ত-সমাজের ক্ষমতাবিন্যাস-জনিত শ্রেণী আর আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীর মধ্যে তিনি এখন তফাত রক্ষা করেছেন লক্ষ করা যায়।

'জর্মান ভাবাদর্শ' তাঁর চিন্তার অপরিণত দিকগুলো চোখে পড়ে কিছু আকস্মিক মন্তব্যে। যেমন "শ্রেণী বুর্জোয়ার সৃষ্ট"। মানেটা প্রায় এরকম, বুর্জোয়া চক্রান্তমূলকভাবে শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। আর যাই হোক শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসের নিশ্চয়ই এতো হালকা ও উদ্ভট ধারণা থাকতেই পারে না। কিন্তু এসব বাক্য তাঁর নিজেরই রচনায় থেকে যাওয়ায় পরবর্তীকালে ফ্যাসাদ বেঁধেছে কম না।

কিন্তু 'দর্শনের দারিদ্র্যে' তিনি অনেক স্পষ্ট। একটা উদ্ধৃতি

> "প্রথমে অর্থনৈতিক অবস্থা জনগণের রূপান্তর ঘটিয়েছে শ্রমিকে। পুঁজির আধিপত্য এই শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক সাধারণ স্বার্থ। অতএব এই জনগণ পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে ইতোমধ্যেই একটি শ্রেণী কিন্তু শ্রেণী হিশাবে সে এখনো হয়ে ওঠে নি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, যে লড়াইয়ের কিছুটা আমরা কতিপয় ছত্রে ব্যক্ত করেছি, এই জনগণ সংগঠিত হয় এবং শ্রেণী হিশাবে নিজের পরিগঠন সম্পন্ন করে।"

এসব মেধাবী কিন্তু সতর্ক প্রণয়ন ছাপিয়ে মনে হয় 'দর্শনের দারিদ্র্যে' শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘাতের কোনো কারণ বা ভিত্তি মার্কস তখনো ভেবে উঠতে পারেন নি। বিমূর্তভাবে এই সংঘাতের তীব্রতার কারণ তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। এই সংঘাতের তীব্রতার কারণ হিশাবে তিনি একদিকে সম্পত্তির পুঞ্জিভবন আর অন্য দিকে দারিদ্র্যের সম্প্রসারণকে দেখিয়েছেন। এই বিমূর্ত সূত্রটাও পরবর্তীতে মূর্তভাবে প্রণীত হয়েছে তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে সম্পত্তির পুঞ্জিভবন ও দারিদ্র্যায়ন প্রক্রিয়া এবং পুঞ্জিভবন ও আত্মস্ফীতিপরায়ণতার অন্তর্ভুক্ত অংশ। অর্থাৎ তা পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের ফল।

তাহলে সামন্তীয় সমাজের পুঞ্জিভূত সম্পত্তি আর দারিদ্র্যের আলাদা একটা ব্যাখ্যা দরকার। মার্কস সেটা আমাদের পেশ করেন নি।

১৮৪৮ সালে মার্কস আর এঙ্গেলস কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে জানালেন যে, "অতীতে বিরাজমান সকল সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস"। শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম মার্কসীয় চিন্তার কেন্দ্রে

খুবই স্পষ্টভাবে স্থাপন করা হয়ে গেলো।

কিন্তু 'পুঁজি' গ্রন্থে আমরা লক্ষ করলাম পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাস, সে সমাজের গতিপ্রকৃতি, সে সমাজের স্বভাব প্রভৃতিকে মার্কস শ্রেণীসংগ্রাম দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন না আদৌ। সেটা তিনি ব্যাখ্যা করছেন পুঁজির নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র দিয়ে। যে চরিত্র আমাদের তো নয়ই এমনকি বুর্জোয়া শ্রেণী বা শ্রমিক শ্রেণীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। পুঁজির আত্মস্ফীতিপরায়ণতা, 'পুঞ্জিভবন-প্রবণতা', বিচলনের ধর্ম সবই সমাজ ও সমাজের ব্যক্তিদের ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল। পুঁজির এইসকল নৈর্ব্যক্তিক স্বভাব ইতিহাসকে বদলাচ্ছে- 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রচ্ছন্ন সারমর্ম এটা। আপাতদৃষ্টিতে ইশতেহার ও পুঁজি গ্রন্থে মার্কসের অবস্থান স্ববিরোধী নয় কি?

আরো সমস্যা আছে। গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের উল্লেখ করি ঃ

'ইশতেহারে' মার্কস বলছেন, "সমাজ সামগ্রিকভাবে ক্রমে ক্রমে দুই বিশাল শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ভাগ হয়ে যাচ্ছে দুই বিশাল শ্রেণীতে, পরস্পরের মুখোমুখি 'বুর্জোয়া আর প্রলিতারিয়েত' এই দুই শ্রেণীতে।"

কিন্তু 'পুঁজি' তৃতীয় খণ্ডে মার্কস লিখছেন ঃ

> "শুধুমাত্র শ্রমশক্তির মালিক, পুঁজির মালিক, আর জমির মালিক, যাদের আয়ের উৎস হচ্ছে যথাক্রমে মজুরি, মুনাফা আর খাজনা অর্থাৎ অন্যকথায় মজুরি-শ্রমিক, পুঁজিপতি আর জমিদার, এরাই হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর নির্মিত আধুনিক সমাজের তিন বিশাল শ্রেণী"।

'ইশতেহারে' আমরা শ্রেণী পেয়েছি দুটো কিন্তু 'পুঁজি' গ্রন্থে আমরা শ্রেণী পাচ্ছি তিনটে। জমির মালিক বা জমিদারকে আমরা 'ইশতেহারে' দেখি নি। পুঁজি গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর পাশাপাশি জমিদার শ্রেণীও সমান প্রতাপশালী। উপরন্তু তা সামন্ত সমাজের নয়। আধুনিক সমাজে, যে সমাজ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার ওপর নির্মিত।

এইসব আপাতঃ স্ববিরোধিতার মীমাংসা করে যাবার সময় মার্কস পান নি। আয়ু কখনোই মানুষের অনুকূলে থাকে না। মার্কসেরও ছিলো না। ছাপার অক্ষরে শ্রেণী সম্পর্কে তিনি মাত্র দেড় পাতা লিখতে

পেরেছিলেন। এর পরপরই তাঁর মৃত্যু ঘটে। দেড় পাতার শেষ লাইনের পর এঙ্গেলস লিখে দিয়েছিলেন,

"এখানে এসে পাণ্ডুলিপি থেমে গিয়েছে"

পাণ্ডুলিপির পরের পাতাগুলো প্রণয়নের দায়িত্ব এখনো সম্পন্ন হয় নি।

"এখানে এসে পাণ্ডুলিপি থেমে গিয়েছে"

শ্রেণী-সংক্রান্ত চিন্তা আসলেই থেমে রয়েছে মার্কসের পাণ্ডুলিপি লিখা বন্ধের পর থেকে। বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা যে হয় নি তা নয়, কিন্তু তা হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবেই, কোনো পরিণতি লাভ করে নি। এমনকি শ্রেণী-সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা আগে মার্কসের যেসব স্ববিরোধিতার উল্লেখ করেছি তার কোনো সুরাহা হয় নি এখনো।

ফলে 'শ্রেণী' শব্দটির নানান প্রকার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অতি প্রতিক্রিয়াশীল মার্কস বিরোধী চিন্তাও শ্রেণী, শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রেণী-সচেতনতা প্রভৃতি শব্দ আউড়িয়ে অনায়াসেই প্রগতিশীলতার লেবাস পরে ঘুরে বেড়ায়, চেনা যায় না।

এ অবস্থা থেকে নিষ্ক্রমণের দুটো পথ অনুসরণের প্রস্তাব রাখছি এখানে, অন্য পথ হয়তো আছে, তবে সেসব সম্ভবত গৌণ। তাই আপাতত আলোচনায় তুলছি না।

এক : মার্কসের চিন্তার প্রতি পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা এবং শ্রেণী- সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর চিন্তার স্ববিরোধিতাগুলো শনাক্ত করা। এই শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর পরিণত উপপাদ্যগুলোকে আলাদা করা এবং বিকশিত করার অবিরল প্রয়াস চালানো এখনকার একটা বড়ো কর্তব্য।

দুই : লেনিনের দ্বারস্থ হওয়া। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দিক নয়, ব্যবহারিক দিক দিয়ে তিনি কিভাবে শ্রেণী শনাক্ত করতেন এবং তার ভিত্তিতে কিভাবে রণকৌশল প্রণয়ন করতেন সেসব গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবনের চেষ্টা করা। বিপ্লবী রাজনৈতিক চর্চার মধ্যেই কেবল 'শ্রেণী' শব্দটির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অর্থের যথার্থতা খুঁজতে হবে। সেদিক থেকে শুধু লেনিনই নন, যে কোনো বিপ্লবীর চিন্তা ও চর্চার মধ্যে এ ধরনের অনুসন্ধিৎসু প্রবেশ ইতিবাচক হতে বাধ্য।

অবস্থান গ্রহণ

কোনো আলোচনাই সম্ভব নয় যদি না আমরা কোনো অবস্থান গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ অবস্থানহীন পর্যালোচনা বা অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হতে পারে না। এটা খুবই স্বাভাবিক যে চিন্তা সবসময় বিকাশমান ফলে অবস্থানেরও বদল ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে কোনো না কোনো অবস্থান থেকে।

তাহলে ওপরে শ্রেণী-সংক্রান্ত বিষয়ে যেসব সমস্যার উল্লেখ করেছি সেসব বিষয়ে আমাদের অবস্থান পেশ করে শেষ করি।

জর্মান ভাবাদর্শে শ্রেণী-সংক্রান্ত বিষয়ে মার্কসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অনুধাবনের উল্লেখ করছি। সেটা হচ্ছে মার্কস স্পষ্টত শ্রেণীকে দুই অর্থে ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন। এক শ্রেণীভবন (Class-in itself) দুই. শ্রেণী সচেতন (Class for itself) বা, অন্যভাবে বললে আমরা বলতে পারি মার্কস নিশ্চেতন শ্রেণী আর সচেতন শ্রেণী এই দুই রকম অবস্থায় শ্রেণীকে বিচার করেছেন। 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি সেখানে স্পষ্টভাবে এই দ্বিবিভাগ লক্ষণীয়। পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে শ্রমিকগণ শ্রেণী হলেও মার্কস বলছেন, "শ্রেণী হিশাবে সে এখনো হয়ে ওঠে নি"। অর্থাৎ সে এখনো নিশ্চেতন। কিন্তু লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তার শ্রেণীচেতনা দানা বাঁধে, শ্রমিক তখন শ্রেণী হিশাবে আবির্ভূত নয়।

'লড়াই' শব্দটির আরো মূর্ত ব্যাখ্যা আমরা মার্কসের কাছে পাই না। কিসের লড়াই বা কী নিয়ে লড়াই যাতে শ্রমিকেরা শ্রেণী হয়ে উঠবে সে বিষয়ে মার্কসের স্পষ্ট ভাষ্য নেই। কিন্তু লেনিন এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ট্রেড্র ইউনিয়নবাদী অর্থনৈতিক লড়াই আর রাজনৈতিক লড়াইয়ের পার্থক্য যোজনা করে। একমাত্র রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই শ্রমিক নিজেকে শ্রেণী হিশাবে উপলব্ধি করতে পারে, এবং শ্রমিক শ্রেণী সামাজিক রূপান্তরে ভূমিকা রাখতে পারে। অন্য কোনো-ভাবে নয়।

লক্ষণীয় যে মার্কসের স্ববিরোধিতার সামনে আমরা একটা বিশেষণ যোগ করে বলেছি এটা আপাত স্ববিরোধিতা। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার রাজনৈতিক ইশতেহার। এর প্রণয়নের দরকার ছিলো রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য—লড়াইয়ের জন্য। অন্যদিকে 'পুঁজি' গ্রন্থে মার্কস নৈর্ব্যক্তিক পুঁজির স্বভাব আবিষ্কারে নিয়োজিত। সে কারণে

'পুঁজি' অর্থশাস্ত্রীয় সন্দর্ভ। পুঁজি তার পুঞ্জিভবন ও আত্মস্ফীতি প্রক্রিয়ার অংশ হিশাবে তিনটি নিশ্চেতন অর্থনৈতিক শ্রেণীর জন্ম দেয়। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা দু'ধরনের রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়, দু'ধরনের রাজনৈতিক শিবিরে সমাজকে বিভক্ত করে। এক. পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে থেকে জাগ্রত নতুন অগ্রসর সমাজ নির্মাণের সচেতনতা-সম্পন্ন শ্রেণী আর এই পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য প্রাণান্ত আরেকটি শ্রেণী। প্রথমটি প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণী, দ্বিতীয়টি বুর্জোয়া শ্রেণী। অতএব সমাজ আসলেই রাজনৈতিক অর্থে দুই বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়। অতএব একজন ধনী যিনি অগ্রসর সমাজের জন্য রাজনৈতিকভাবে লড়েন তিনি আসলে সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্গত, আর একজন শ্রমিক যিনি এই পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য লড়েন, এমনকি যিনি কেবল ট্রেড ইউনিয়ন লড়াই করেই ক্ষান্ত থাকেন তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিক হলেই তিনি শ্রমিক শ্রেণীর চেতনাসম্পন্ন হবেন এমন কোনো কথা নেই। অন্যভাবে বললে বলা যায় অর্থনৈতিক শ্রেণী এবং রাজনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে দ্বিবিভাগ মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন সবাই করছেন।

রাজনৈতিক অর্থে শ্রেণী মানে সবসময়ই চৈতন্যের একটি অবস্থান। বিরাজমান নৈর্ব্যক্তিকতার প্রতি সক্রিয় ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এবং তৎপরতা। এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং তৎপরতাই শ্রেণীসচেতনতার ভিত্তি। এই সচেতনতা বিচার করেই কেবল নির্ধারণ করতে হবে কে শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর কে বুর্জোয়া শ্রেণীর।

তবে অর্থনৈতিক অবস্থান রাজনৈতিক চেতনা পরিগঠনের জন্য নৈর্ব্যক্তিক শর্ত তৈরি করে, কিন্তু ব্যক্তি সবসময়ই ইচ্ছা করলে সে শর্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে।

নইলে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনকে আমরা কোথায় পেতাম? তাঁরা কি বুর্জোয়া শ্রেণীর (?) অন্তর্ভুক্ত নন?

এ নিয়ে আমরা আগামী পাঠশালাগুলোতে আরো বিতর্ক করবো। তার জন্যই এই ছোট খসড়া রচনা।

'শ্রেণী' সম্পর্কে আমরা যেন আরো গভীরভাবে ভাবতে পারি তার জন্যই এই নোট।

পুঁজি

পুঁজি সংক্রান্ত কিছু মৌলিক বিষয় এখানে আমরা পেশ করছি। আলোচনা এখানে ততোটুকুই মাত্র করা হয়েছে যাতে আমাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আন্তরিক বিপ্লবী কর্মীদের একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে। বিশেষত পুঁজি সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণার তুলকালাম আধিপত্যের কারণে রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা না হয়।

১. পুঁজি হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক

পুঁজি সংক্রান্ত যে ধারণা সমাজে কমবেশি প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, পুঁজি মূলত সঞ্চয়জাত সম্পদ। এই সঞ্চিত সম্পদটা বিনিয়োগে খাটানো যায়, যে বিনিয়োগ থেকে লাভ আসে। পুঁজি অতএব সঞ্চিত সম্পদ মাত্রই নয়, এটা লাভেরও উৎস। সুদখোর টাকা খাটায় এবং সে টাকা থেকে সুদ পায়, ব্যবসায়ী টাকা খাটায় এবং সে টাকা থেকে লাভও আসে, তেমনি কারখানার মালিকও টাকা খাটায় এবং সে টাকা মুনাফা সৃষ্টি করে। অতএব পুঁজির সাধারণ মানে হচ্ছে টাকা খাটিয়ে সুদ, লাভ বা মুনাফা আত্মসাৎ করা। এই সুদ, লাভ বা মুনাফার উৎপত্তি টাকা থেকে। সেকারণে পুঁজি মানে এই সুদ লাভ বা মুনাফা পয়দা করার ক্ষমতা সম্পন্ন টাকা। পুঁজিকে টাকার ভেতরকার এক ভূতুড়ে শক্তি হিশাবে গণ্য করা, যে শক্তি এক অদৃশ্য যাদু বলে টাকা থেকে সৃষ্টি করে আরো টাকা। কিন্তু কোথা থেকে টাকার এই ক্ষমতার উৎপত্তি বা আদৌ তা টাকার ক্ষমতা কিনা সেসব বিচার করা হয় না । টাকাই সবকিছুর উৎস, পুঁজি টাকার ভেতরকারই এক ঐশ্বরিক শক্তি। তা সে টাকা সোনার মোহর হোক, ডলার-পাউন্ড হোক বা হোক বাংলাদেশের বাঘমার্কা কাগুজে টাকা।

যারা বুদ্ধিমান তারা বুঝতে পারে টাকা থেকে টাকার পয়দা হয় না। তখন তারা ধারণা করে পুঁজি তাদের নিজেদের খাটাখাটনির ফল, কিম্বা যদি তারা কারখানার মালিক হয় তবে পুঁজিকে তারা মেশিনপত্রের ক্ষমতা হিশাবেও দেখে। আর ভাবে যে মেশিন ও উৎপাদন সরঞ্জামের বিশেষ গুণের কারণে কারখানার পণ্য-সামগ্রী খরচের চেয়েও বেশি দাম বহন করে উৎপাদিত হচ্ছে, সেই বাড়তি দামটা বাজার থেকে উঠে আসে বিক্রির পর পর। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে পুঁজির ধারণা "ভূতুড়ে শক্তির" ধারণা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। একাংশ ভাবে এই শক্তি টাকার, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমানেরা মনে করে এটা মেশিনের।

মার্কস তাঁর তরুণ বয়সেই বুঝেছিলেন যে, পুঁজির এই ভূতুড়ে শক্তির ধারণা ফালতু কথা। তাঁর পরিণত বয়সের রচনায়– বিশেষত "পুঁজি" গ্রন্থে পুঁজি কি তার বিশদ উত্তর সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষ হয়ে তিনি হাজির করেছিলেন। কিন্তু 'পুঁজি' গ্রন্থ রচনার বহু আগে তিনি আর এঙ্গেলস ঘোষণা করেছিলেন ঃ

> "পুঁজিপতি হওয়া মানে উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। পুঁজি একটা যৌথ সৃষ্টি, সমাজের অনেক লোকের মিলিত কাজের ফলে, এমনকি শেষ বিশ্লেষণে, সমাজের সকল লোকের মিলিত কর্মেই পুঁজিকে চালু করা যায়।
>
> পুঁজি তাই ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি।" (ইশতেহার ঃ ৪৪)

এই সহজ কথাটার সহজ মানে আমরা আগে বুঝে নেবার চেষ্টা করবো।

পুঁজির বিচলনটা আমরা আগে লক্ষ করি। একজন পুঁজিপতি টাকা দিয়ে কী করে? টাকা দিয়ে প্রথমত সে মেশিনপত্র আর কারখানার সাজ-সরঞ্জাম কেনে। যেসব পুঁজিপতি মেশিনপত্র আর উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম তৈরি করে তাদের কাছ থেকেই সে তার প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপায় ও উপকরণ কেনে। এর ফলে পরস্পরের সঙ্গে একটা বিনিময়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বিনিময় এখানে নিছক আদান-প্রদান নয়, কারণ বিনিময় দেয়া নেয়ার ব্যাপার নয় কেবল। মেশিনপত্র বিক্রেতাদের পুঁজি আটকে ছিলো মেশিনপত্রে আর সাজ-সরঞ্জামে– সেটা বিক্রি হবার কারণে পুঁজি ছাড়া পেয়ে টাকায় রূপান্তর লাভ করছে

এই বিনিময়ের মাধ্যমে, অন্যদিকে যে পুঁজিপতি তা কিনলো সে তার পুঁজির একটা অংশকে রূপান্তর করতে পারলো উৎপাদনের উপায়ে। পরস্পর পরস্পরকে ব্যবহার করলো তারা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এবং পুঁজির রূপ বদলও ঘটে গেলো ওর মধ্যেই।

বিনিময় তেমনি এই পুঁজিপতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলো কাঁচামালের পুঁজিপতিদের সঙ্গেও। কিন্তু পুঁজিপতি উৎপাদনের উপায় আর উপকরণ কেনার পরেই উৎপাদনে যেতে পারে না। তাকে উৎপাদন শুরু করবার আগে কিনতে হয় শ্রমশক্তি– শ্রমিকরা যা বিক্রি করে। শ্রমশক্তি এক অদ্ভূত নতুন ধরনের পণ্য। বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতির সঙ্গে শ্রমিকের কিম্বা পুঁজির শ্রমের একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্ক পরিগ্রহণ করে বলেই মার্কস শ্রমকে মূল্যোৎপাদক পুঁজি (Variable Capital) হিশাবে আখ্যায়িত করেছেন। যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়া উৎপাদন সম্পন্ন হতে পারে না, আবার শ্রমিকের পক্ষেও বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। পুঁজির যে অংশ শ্রমিক মজুরি হিশাবে পায় সেটা তারা খরচ করে ভোগ্য পণ্য কিনবার কাজে। সেক্ষেত্রে সে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদককে ও ব্যবসায়ীকে পণ্য বিক্রির সুযোগ করে দিচ্ছে, অতএব তাদের সঙ্গেও একটা সম্পর্ক ঘটছে শ্রমিকের।

এই যে বহুমুখি জড়ানোপেঁচানো সম্পর্ক এ সম্পর্কে মার্কসের ভাষা হচ্ছে ঃ

> "অতএব ভিন্ন ভিন্ন পুঁজির বিচলন-চক্র পরস্পরের সঙ্গে সুতোর মতো জড়ায়, পরস্পরের পূর্ব উপস্থিতি জ্ঞাপন করে, পরস্পরের উপস্থিতির অনিবার্যতা প্রতিষ্ঠা করে এবং একের সঙ্গে অপরের ঠিক এই সুতলীগাঁথা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পুরো পুঁজি সমাজকে গতি প্রদান করে। (পুঁজি দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ৩৫৩)।

এই জড়ানোপেঁচানো সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পুঁজি হয়ে ওঠে যৌথ শক্তি, এই যৌথতা সবাইকে নিয়ে, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সর্বস্তরে এই সম্পর্ক পরিব্যাপ্ত, শ্রমিকও এই যৌথতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উল্লেখযোগ্য যে, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকের অস্তিত্ব পুঁজির দরকারে, তার শ্রম পুঁজিকে স্ফীতি দান করবার জন্যই ব্যবহৃত। তাহলে 'যৌথ শক্তি' হিশাবে মার্কস-এঙ্গেলস ইশতেহারে যে কথাটা বলেছিলেন তার ব্যাখ্যা ওপরের আলোচনা থেকে আমরা পাচ্ছি। কিন্তু এক্ষেত্রে যে যৌথ শক্তি

বা যে সামাজিক সম্পর্ককে আমরা চিহ্নিত করেছি তা মূল সম্পর্কের বাইরের দিক, ভেতরের দিকটা আমাদের এখন বুঝতে হবে।

এটা স্পষ্ট যে, বিনিময় একটা সামাজিক সম্পর্ক। পুঁজির সঙ্গে পুঁজির এবং পুঁজির সঙ্গে শ্রমের একটা সুস্পষ্ট সম্পর্ক ওপরে আমরা দেখলাম। কিন্তু এই সামাজিকতার মর্মের দিকটা নিহিত রয়েছে উৎপাদনে। আরো স্পষ্ট করে বললে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক উৎপাদনে। কারণ সামাজিক সম্পর্কটা মর্মের দিক থেকে উৎপাদন-সম্পর্কেরই অভিব্যক্তি। সেটাই আমরা এখন বিশ্লেষণ করবো। ওপরের আলোচিত সামাজিক সম্পর্ককে আমরা পুঁজির রূপের দিক হিশাবে বাইরের সম্পর্ক হিশাবে বিচার করেছি। এখন তার মর্মের দিকটাও আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

অতএব প্রশ্ন, বিনিময়ের মর্মের দিকটা কী? এখানে মনে রাখা দরকার আমরা সুনির্দিষ্টভাবে পণ্য বিনিময়ের কথা বলছি। মানুষ পণ্য হিশাবে সবকিছু বিনিময় করে না। যেমন, উপহার বিনিময়। পণ্য বিনিময় পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা নয় কিন্তু "যেসব সমাজে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাধান্য সেসব সমাজের সম্পদ পণ্যের এক বিপুল সংগ্রহ হিশাবে হাজির থাকে" (পুঁজি প্রথম খণ্ড ঃ ১২৫)। মার্কস সে জন্য পুঁজি গ্রন্থে পুঁজির বিশ্লেষণ শুরু করেছেন পণ্য থেকে। উপযোগিতা-মূল্য আর বিনিময়-মূল্য পণ্যের দুটো আবশ্যিক দিক। অন্যদিকে পণ্যের বিনিময়কে ব্যাখ্যা করলেই পণ্যের সামাজিক দিকটা বোঝা যায়, ফলে পুঁজিরও, কারণ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা সর্বব্যাপী পণ্য-উৎপাদন-ব্যবস্থার অধিক কিছু নয়। কিন্তু সেটা সর্বব্যাপী হতে হবে। খেয়াল রাখা দরকার, পণ্য-উৎপাদন মানেই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন নয়। কিন্তু পণ্যের বিশ্লেষণের মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের মূল দিকগুলো সরল ভাবেই ধরা পড়ে।

আলোচনাকে সহজ করার জন্য আমরা একটি সরল বিনিময়ের উদাহরণ দিয়ে আমাদের বিশ্লেষণ শুরু করবো।

দুজন উৎপাদক : একজন কৃষক, একজন তাঁতী। ধরা যাক তারা নিজেরাই নিজেদের উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক। অর্থাৎ শ্রম এখানে শ্রম সম্পাদনের নৈর্ব্যক্তিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত। উৎপাদনের উপায় থেকে তারা কেউ বিচ্ছিন্ন নয়। সেসবের তারা ব্যক্তিগত মালিক। ফলে উৎপাদনে তারা আলাদা আলাদাভাবে নিয়োজিত, অতএব

পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা একই গ্রামের বাসিন্দা হতে পারে এবং সকাল-বিকাল সামাজিক নানান আচার-অনুষ্ঠানে তাদের দেখা সাক্ষাৎও হয়, কিন্তু উৎপাদনের দিক থেকে পরস্পরের কাছ থেকে তারা স্বাধীন। উৎপাদনের দুই ভিন্ন পরিমণ্ডলে দুজনের আলাদা অবস্থান।

যদি তারা দুজনেই বাংলাদেশে না থেকে একজন থাকে আমেরিকায় বা জাপানে? সেক্ষেত্রেও তারা পরস্পর থেকে স্বাধীন, অতএব, দুজনে বাংলাদেশে থাকা আর না থাকার কারণে বিশ্লেষণে কোনো হেরফের হবে না।

এখন ধরা যাক, কৃষক চাল উৎপাদন করলো আর তাঁতী করলো কাপড়। এবং দুজনের কারুরই শুধু চাল আর শুধু কাপড় হলে চলে না, দুটোই দরকার। সেক্ষেত্রে তাদের বিনিময় না করে গত্যন্তর নেই। বিনিময় কেন? কারণ তারা উৎপাদনে নিয়োজিত হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হিশাবে, উৎপন্ন দ্রব্য অতএব তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের প্রয়োজন মিটতে পারে। এই পরিস্থিতিতে বিনিময়ের জন্য পরস্পরের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে নেয়া তখন জরুরি হয়ে পড়ে। মার্কস বলছেন মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে শ্রম। নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল আর নির্দিষ্ট সংখ্যক কাপড় তৈরি করতে কতো ঘণ্টা শ্রম খরচ হলো সেটা দিয়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়।

ধরা যাক আমাদের উদাহরণে ৩ গজ কাপড় তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৫ ঘণ্টার শ্রম আর ঠিক ৫ ঘণ্টার শ্রম খরচ করে উৎপাদিত হয়েছে ১০ সের চাল। তাহলে ৩ গজ কাপড়ের সঙ্গে ১০ সের চালের বিনিময় হবে, কারণ শ্রম ঘণ্টার হিশাবে তাদের মূল্য সমান।

বিনিময়ের মধ্য দিয়ে কী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? একটা উৎপাদন সম্পর্ক। দুই বিচ্ছিন্ন উৎপাদক তাদের পণ্যকে বিনিময়ের জন্য বাজারে নিয়ে গিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন উৎপাদনকে সামাজিক করে তুলছে।

বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন শ্রম কিভাবে সামাজিক হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে মার্কস বলছেন ঃ

> "প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো পণ্য হয়ে ওঠার একমাত্র কারণ হচ্ছে তারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের শ্রমের ফসল–যারা পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করছে। এই সকল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের শ্রমের যোগফল নিয়েই সমাজের মোট শ্রম গঠিত। যেহেতু

তাদের শ্রমের ফসল বিনিময় করবার আগে উৎপাদকদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র এই বিনিময়ের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। অন্যভাবে বললে বলা যায় একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির শ্রম সমাজের মোট শ্রমের অংশ হিশাবে নিজেকে পেশ করতে পারে শুধুমাত্র সেই সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়ে, বিনিময়ের সক্রিয়তা উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে যাদের প্রতিষ্ঠা করে, আর তাদের মাধ্যমে উৎপাদকদের মধ্যে।" (পুঁজি প্রথম খণ্ডঃ ১৬৫)

বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আলাদা আলাদা শ্রম সামাজিক হয়ে উঠেছে, মার্কসের এই অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ পুঁজির সামাজিকতা অনুধাবন করার জন্য জরুরি। এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য পুঁজির আন্তর্জাতিক চরিত্র সংক্রান্ত আলোচনায় আরো স্পষ্ট হবে।

বিনিময় কিভাবে রূপে ও মর্মে সামাজিক সম্পর্ক– বিশেষত উৎপাদন সম্পর্ক, সেটা এখন আর আমাদের অস্পষ্ট থাকবার কথা নয়। কিন্তু তবু ব্যক্তিগত সম্পত্তির দিক থেকে দু-একটা কথা বলা বাকি থেকে যায়।

আমরা লক্ষ করেছি বিনিময় সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা আর অনিবার্যতা সৃষ্টির কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানা। উৎপাদনের উপায়গুলো ব্যক্তিগত মালিকদের দখলে থাকবার কারণেই তারা বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর থেকে স্বাধীন অবস্থায় উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন পণ্য বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। বিনিময় অর্থাৎ বাজারই হচ্ছে তাদের সামাজিকতার ক্ষেত্র। সম্পত্তির দিক থেকে দেখলে সম্পর্কটা এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির। বিনিময় মানে এক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে আরেক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। পণ্যের মূল্য নির্ধারণের মধ্য দিয়ে এবং পণ্যের মূল্য আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে যে সম্পর্ক নিজেকে ঘোষণা করে। পণ্য যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হতো তাহলে তা ভোগ করবার জন্য কাউকে দাম দিতে হতো না। বেওয়ারিশ গাছের ফল খেয়ে কেউ ফলগাছকে পয়সা দিয়েছে এমন আজগুবি ঘটনা কেউ শোনে নি। অতএব পণ্যের মূল্য বা টাকার ভাষায় পণ্যের দাম ব্যক্তিগত সম্পত্তির সামাজিক সম্পর্ককেই ব্যক্ত করে। পণ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই এক ধাপ বিকাশ। বিকাশের যে পর্যায়ে মূল্য বা দাম হিশাবে তার নৈর্ব্যক্তিক আবির্ভাব ঘটেছে।

মূল্য বা দামের উপস্থিতি ও চলাচলের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তাদের নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্কগুলোই যে হাঁটাচলা করছে মার্কসের এই আবিষ্কার এক অসামান্য কীর্তি।

২. পুঁজি হচ্ছে আত্মস্ফীতিপরায়ণ মূল্য (Self-expanding Value)

পুঁজি হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক—একটা 'যৌথ শক্তি'। এই সিদ্ধান্ত অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু পুঁজির ধর্ম কী? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে পুঁজির স্বভাবের মধ্যে। খুঁজতে হবে পুঁজির বৈশিষ্ট্য-সূচক সেই চরিত্রের মধ্যে যার কারণে পুঁজি শুধু সামাজিক সম্পর্কই নয়, পুঁজি পুঁজিও বটে। কী সেই বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম ?

আমরা আগের উদাহরণে ফিরে যাই। কৃষক আর তাঁতীর উদাহরণ। পণ্যোৎপাদন বিকশিত হলেই সমাজে উদ্ভব ঘটে মুদ্রার বা টাকার, তখন পণ্যের বিনিময় সম্পাদিত হয় মুদ্রা বা টাকার মাধ্যমে। কৃষক বা তাঁতী তাদের পণ্য আগে বাজারের অন্য যে কোনো ক্রেতার কাছে বিক্রি করে, তারপর বিক্রির টাকা দিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে চাল বা কাপড় কিনে নেয়। বিক্রির মধ্য দিয়ে এই দুই পণ্যের বিচলনের ধরনটা হচ্ছে এরকম ঃ

তাঁতীর ক্ষেত্রে : কাপড়—টাকা—চাল

কৃষকের ক্ষেত্রে : চাল—টাকা—কাপড়

কাপড় এবং চাল হচ্ছে পণ্য। যদি বিচলনের এই দুই রূপকে আমরা সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করি তাহলে উভয় বিচলনের রূপ দাঁড়ায়:

প—ট—প

(ট—টাকা; প—পণ্য)

পুঁজিতান্ত্রিক বিচলনের রূপ কিন্তু ভিন্নরকম। পণ্য বিচলনের যে সাধারণ রূপ আমরা ওপরে দেখছি সমাজে তার প্রতিষ্ঠা ঘটলে পুঁজিতান্ত্রিক বিচলনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। পুঁজিতান্ত্রিক বিচলন শুরু হয় টাকা থেকে—পণ্য থেকে নয়। টাকা দিয়ে প্রথমে কেনা হয় পণ্য,

তারপর সে পণ্য বিক্রি করে তাকে আবার রূপান্তর ঘটানো হয় টাকায়। বিচলনের রূপটা এখানে ওপরের রূপের ঠিক বিপরীত ঃ

ট—প—ট

কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ঘটে যায়– যার নিরসন না হলে এই বিচলন অর্থহীন। সেটা কী?

আগের যে রূপ আমরা বিধৃত করেছি সেখানে দেখা যায় কৃষক চাল কিনে প্রথমে টাকা হাতে নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু পরক্ষণেই সেই টাকা দিয়ে সে কাপড় কিনেছে। তাঁতীর ক্ষেত্রেও একই কথা, কাপড় বিক্রির টাকা তাঁতী ব্যবহার করে চাল কিনবার জন্য। অর্থাৎ উভয়ের লক্ষ্য হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যমে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবহার্য দ্রব্যের জোগাড়। দুজনে যে দুটো পণ্য বাজারে নিয়ে এসেছে এগুলো তাদের পরস্পরের প্রয়োজন মেটায়– দুই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন : চালের আর কাপড়ের। অতএব নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে প—ট—প ধরনের বিচলন সম্ভব এবং এই বিচলনের উদ্দেশ্য স্রেফ প্রয়োজন মেটানো। টাকার ভূমিকা এখানে নিছকই বিনিময়ের কাজ সম্পাদনের জন্য। বিনিময় শেষ হলে টাকারও আর কোনো ভূমিকা থাকে না। অর্থাৎ চাল আর কাপড়ের মধ্যে স্থান বদল বা দখলের ঘটনা ঘটিয়ে দেবার পর টাকার ভূমিকা শেষ।

কিন্তু বিচলনের দ্বিতীয় রূপটায় আমরা কী দেখছি? টাকা বিনিময়ের শেষে পরিবর্তিত হচ্ছে ফের টাকায়, আগের রূপে একদিকে ছিলো কাপড় আর অন্য দিকে চাল, তারা ছিলো দু'রকমের জিনিস, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এদিকেও টাকা ওদিকেও টাকা; এ বিনিময় অবাস্তব, এটা অবিশ্বাস্য যে কেউ দশ টাকা দিয়ে কিছু কিনে ফের আবার তা দশ টাকার জন্য বিক্রি করবে।

কিন্তু এক ক্ষেত্রে সম্ভব। যদি বিচলনের ডান দিকের টাকা, অর্থাৎ বিনিময় শুরু করার আগে যে টাকা তার পরিমাণের চেয়ে বিচলন শেষ হবার পর যে টাকা হাতে আসে তার পরিমাণ বেশি হয়। অর্থাৎ দশ টাকা দিয়ে বিচলন শুরু হলে সে টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দশের বেশি হতে হবে। বিনিময়ের উদ্দেশ্য এ ক্ষেত্রে টাকার বৃদ্ধি, টাকার স্ফীতি। বিনিময়ের স্ফীতিপরায়ণ এই চরিত্রটা ধরবার জন্য বিচলনের রূপটাকে উপস্থাপন করা হয় শেষের টাকার বৃদ্ধিতে কোনো একটা সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে।

যেমন ঃ

ট—প—ট*

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তারকাযুক্ত (ট) এর পরিমাণ তারকাহীন (ট)– এর চেয়ে বেশি। দেখা যাচ্ছে টাকা এখানে মোটেও শুধু বিনিময়ের ভূমিকা পালন করছে না, যে বিচলন বা যে বিনিময় এখানে সম্পন্ন হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হচ্ছে টাকা দিয়ে টাকা বাড়ানো। টাকা এখানে হাজির হচ্ছে একটা আত্মস্ফীতিপরায়ণ চরিত্র নিয়ে। ঠিক এই চরিত্রটাই হচ্ছে পুঁজির চরিত্র। এই আত্মস্ফীতিপরায়ণতাই হচ্ছে পুঁজির ধর্ম। এই ধর্ম না থাকলে টাকা নিছক টাকা, তার ভূমিকা কেবল বিনিময় সম্পাদন। তার বেশি কিছু নয়। টাকাকে পুঁজি থেকে আলাদা করে শনাক্ত করা এবং টাকা-রূপি পুঁজিকে সুস্পষ্টভাবে নিছক টাকা থেকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি পুঁজি গ্রন্থে আমাদের শিখিয়ে গেছেন মার্কস সেই বহু বহু বছর আগে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর চিন্তা-চেতনার খপ্পরে পড়ে থাকবার কারণে অনেকেই এই শিক্ষা এখনো আত্মস্থ করতে পারে নি।

আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে উৎপাদন অনুষ্ঠিত হলে উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক অভিব্যক্তি লাভ করে মূল্যের মধ্যে, যে মূল্যের হিশাব সর্বহারা শ্রেণী করে শ্রমের পরিমাণ দিয়ে। যে পরিমাণ সামাজিক শ্রম পণ্যের মধ্যে নিহিত সেই সামাজিক শ্রমের হিশাব দিয়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। এই মূল্য নির্ধারণটা নেহায়েত মানসিক হিশাব নয়। মূল্যের অস্তিত্ব ও অভিপ্রকাশ নৈর্ব্যক্তিক–ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়।

দাম হচ্ছে মূল্যেরই টাকার রূপ। পণ্যের মূল্য টাকার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং তার ফলে পণ্যের দাম হিশাবে তা পরিগঠিত হয়ে ওঠে। অতএব দাম হচ্ছে পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ সামাজিক শ্রম আছে, টাকার হিশাবে, সেই সামাজিক শ্রমেরই অভিব্যক্তি।

অর্থাৎ মূল্যই নিজেকে নিজে স্ফীতি দান করে, পুঞ্জিভূত হয়, বেড়ে ওঠে ইত্যাদি। ঠিক ও কারণেই পুঁজির সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হচ্ছে–পুঁজি আত্মস্ফীতিপরায়ণ মূল্য।

আমরা এর আগে ব্যাখ্যা করেছি যে, মূল্য হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে সংগঠিত উৎপাদনের যে সামাজিক সম্পর্ক তারই অভিব্যক্তি।

দেখা যাচ্ছে পুঁজি এই সম্পর্কেরই ভূতুড়ে স্ফীতি। সামাজিক সম্পর্কটাই একটা নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হিশাবে উদ্ভূত, যে শক্তি নিজেই নিজের চালক। **পুঁজিপতির চৈতন্য বা ব্যক্তিত্বের ওপর ভর করে নিজের আত্মস্ফীতি ও পুঞ্জিভবনের পরিকল্পনা পুঁজি নিজেই সম্পন্ন করে। মার্কস পুঁজির এই সার্বভৌম ক্ষমতা আর পুঁজিপতির ব্যক্তি ইচ্ছাকে এক করে ফেলেন নি।**

আত্মস্ফীতিপরায়ণ মূল্য হিশাবে পুঁজির এই বৈশিষ্ট্যের আদি রূপ হচ্ছে ব্যবসায়িক পুঁজি এবং সুদভোগী মহাজনী পুঁজি। কিন্তু পুঁজির এই দুটো রূপ পুঁজির শুরুর দিককার রূপ। পুঁজি যতোক্ষণ পর্যন্ত না উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিজের ধর্মানুসারে গড়ে না তুলছে যতোক্ষণ পর্যন্ত পুঁজি পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়েছে বলা যায় না, তাহলে পুঁজির পূর্ণ বিকশিত রূপটা কেমন?

সম্পত্তির অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করেছি পুঁজির উদ্ভবের শর্তগুলো কী। টাকা যখন শ্রম আর উৎপাদনের হালহাতিয়ার বাজার থেকে কিনতে পারে এবং কিনে তাদের উৎপাদনে নিয়োজিত করতে পারে কেবল তখন পুঁজি উৎপাদনকে নিজের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তখন তার আত্মস্ফীতির উৎস হয়ে দাঁড়ায় তার নিজের উদ্যোগে সংগঠিত উৎপাদন। কৃষক বা তাঁতীর পুঁজির বিচলনের বাইরে সংগঠিত স্বাধীন পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা তখন লোপ পায়। শ্রম এবং শ্রম সম্পাদনের পরিমণ্ডলে পরস্পরের সাথে বিচ্ছেদের ফলে শ্রম এবং শ্রম-সম্পাদনের হালহাতিয়ার উভয়েই পণ্য হিশাবে আবির্ভূত হয়। উৎপাদন তখন পুঁজির বিচলন প্রক্রিয়ার একটা মুহূর্তমাত্র হয়ে ওঠে। উৎপাদনের মুহূর্তে শ্রমিকের বাড়তি শ্রম শোষণ করে পুঁজি নিজের স্ফীতি অর্জন করে। পুঁজির এই পূর্ণ রূপটা সাংকেতিক ভাবে এভাবে পেশ করা যায় ঃ

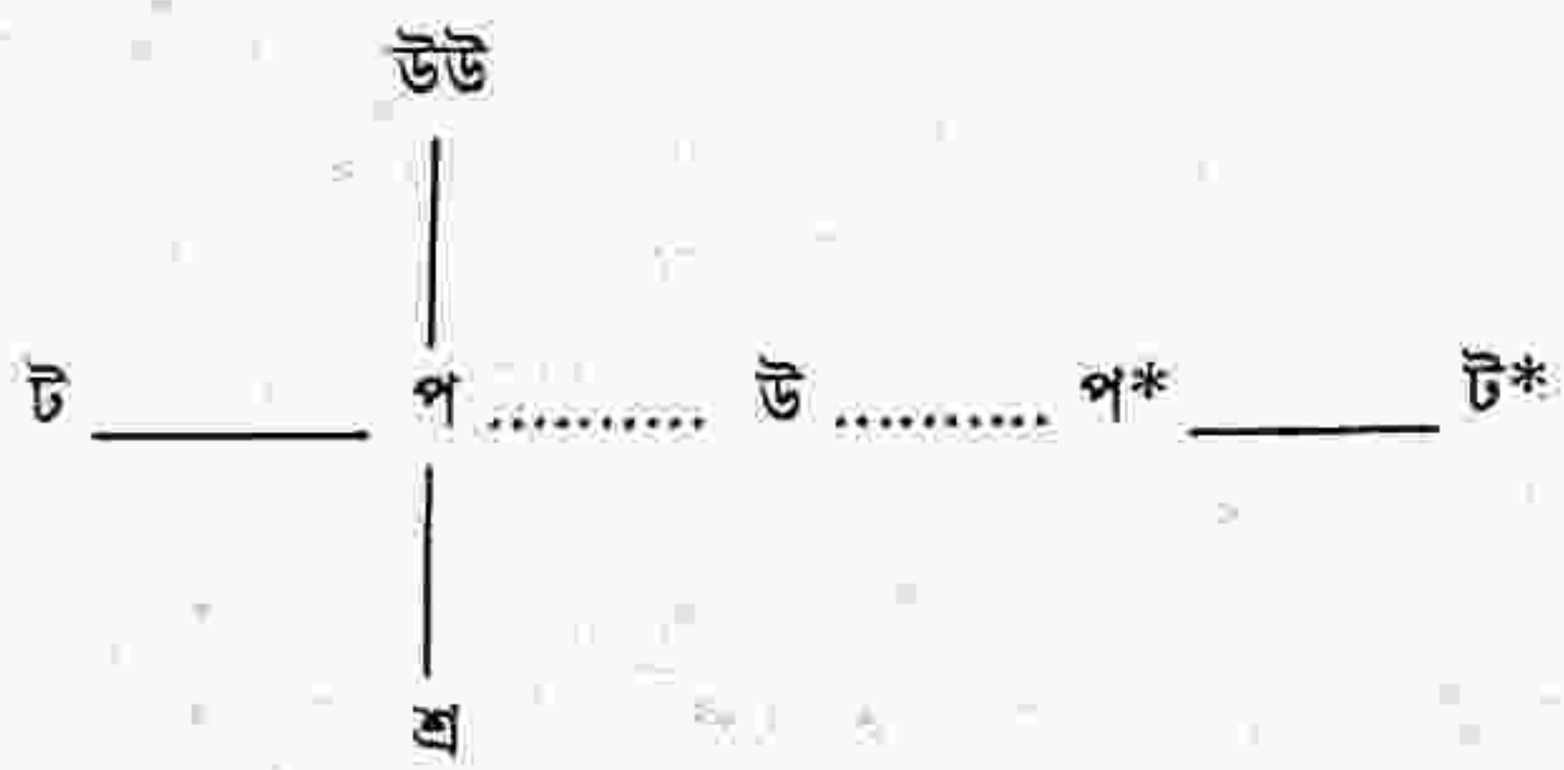

এখানে ঃ ট—টাকা বা মুদ্রা পুঁজি

প—পণ্য পুঁজি, উৎপাদন শুরুর আগে এই পণ্য পুঁজি দু'রকম

উউ—উৎপাদনের উপায়

শ্র—শ্রম শক্তি

উ—উৎপাদক পুঁজি–অর্থাৎ উপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তির সংযোগে পুঁজির বাড়তি মূল্য শোষণের রূপ

প—বাড়তি মূল্য বহনকারী পণ্য পুঁজি, প—এর চেয়ে বেশি এর মূল্য

ট—বাড়তিমূল্য উশুল হবার পর টাকা বা মুদ্রা পুঁজি বলা বাহুল্য ট থেকে ট* পরিমাণ বেশি হতে বাধ্য, কারণ পুরো উৎপাদনের লক্ষ্যই হচ্ছে কম মূল্য বিনিয়োগ করে বেশি মূল্য উৎপাদন করা।

(——)— সংযোগ লাইন মানে এক্ষেত্রে পুঁজির রূপের পরিবর্তন ঘটছে বিনিময়ের মধ্য দিয়ে

(.....)—বিন্দু চিহ্ন মানে এক্ষেত্রে কোনো বিনিময় সম্পাদিত হয় নি।

উৎপাদনকে পুঁজি নিজের অধীনে নিয়ে আসার পর বিচলনের উপরিউক্ত পরিপূর্ণ রূপটির প্রতিষ্ঠা ঘটে। যেটা লক্ষণীয় তা হচ্ছে পুঁজির মোটেও সুনির্দিষ্ট বা স্থির কোনো রূপ নেই। বিচলনের এক-একটা পর্যায়ে তার রূপও ভিন্ন ভিন্ন।

> "সব মিলিয়ে পুঁজি তার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে এক সঙ্গে একই জায়গায় পাশাপাশি অস্তিত্বমান। কিন্তু তার এক একটা অংশ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায় পার হচ্ছে, অতিক্রম করছে এক কার্যকর রূপ থেকে আরেক কার্যকর রূপ এবং ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক প্রকার রূপেই তার ভূমিকা সম্পাদন করে চলেছে।" (পুঁজি দ্বিতীয় খণ্ডঃ ১০৪)

পুঁজির স্থিরনির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই এই বিষয়টি বুঝতে না পারার কারণে বুর্জোয়া তত্ত্ব কখনো টাকা, কখনো মেশিনপত্র বা কখনো জমিকে পুঁজি হিশাবে গণ্য করে। তাদের ভাষায় এগুলো "উৎপাদনের উপাদান" (Factors of Production) । এগুলোকে একত্র করে যে

উৎপাদন সংগঠিত হয় সেটাই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের সংজ্ঞা। ইতিহাসের সব পর্যায়েই উৎপাদনের এই উপাদানগুলোর প্রয়োজন হয়। অতএব এই তত্ত্ব মানলে এটাও মানতে হয় যে, ইতিহাসে সবসময়েই পুঁজির অস্তিত্ব ছিলো ও থাকবে। পুঁজিসংক্রান্ত এই বুর্জোয়া ধারণা থেকে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁরাও মুক্ত নন। বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া একটা কঠিন লড়াইয়ের ব্যাপার। সর্বহারা শ্রেণীর অনেক আন্তরিক কর্মী মনে করেন যে, টাকা দিয়ে শ্রম এবং শ্রমের হাতিয়ার কিনে বাড়তি মূল্য উৎপাদন করার তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করা গেলেই পুঁজিকে বোঝার কাজ শেষ হয়ে যায়। এই তত্ত্বের সঙ্গে বুর্জোয়া তত্ত্বের বাহ্যিক অমিল থাকলেও তফাৎ বেশি নয়। কারণ এক্ষেত্রে পুঁজিকে শনাক্ত করা হয় বুর্জোয়া তত্ত্বের মতো 'উৎপাদনের উপাদান'গুলো দিয়ে। অথচ উৎপাদনে পুঁজি যখন শ্রম এবং শ্রমের হাতিয়ার নিয়ে নিয়োজিত হয় সেটা তার একটা বিশেষ রূপ মাত্র। যার নাম মার্কসের ভাষায় পুঁজির 'উৎপাদক রূপ' বা যাকে বলা যায় "উৎপাদক পুঁজি"।

শ্রমের বেচাকেনার মধ্যে এবং উৎপাদক পুঁজি হিশাবে শ্রমকে শোষণ করার মধ্যে যে শ্রেণী সম্পর্ক সেটা অনুধাবন করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ; কিন্তু পুঁজিকে অনুধাবনের জন্য এই উপলব্ধি যথেষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে মার্কসের একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতি হচ্ছে এরকম ঃ

> "আত্মস্ফীতিপরায়ণ মূল্য বোঝাতে পুঁজি শুধুমাত্র শ্রেণী সম্পর্ক অর্থাৎ মজুরি শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট চরিত্রের সমাজকেই অন্তর্ভুক্ত করে না। এ হচ্ছে একটি গতি, একটি বিচলনচক্র পরিক্রমার প্রক্রিয়া—বিভিন্ন পর্যায় যাকে পার হতে হয়, যে নিজে বিচলনপ্রক্রিয়ার তিনটি রূপ নিজেই তৈরি করে। সুতরাং একে শুধুমাত্র গতি হিশাবেই বোঝা সম্ভব, স্থির কোনো বস্তু হিশাবে নয়।"
>
> (পুঁজি দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ১০৫)

পুঁজির এই আত্মস্ফীতিপরায়ণ চরিত্র বিভিন্ন পুঁজির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয় প্রতিযোগিতা হিশাবে। বুর্জোয়া শ্রেণী মনে করে প্রতিযোগিতা পুঁজির অন্তর্নিহিত কোনো স্বভাব নয়, তার বাইরের একটা দিক। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণী পুঁজির আত্মস্ফীতিপরায়ণ চরিত্র কখনোই বিস্মৃত হয় না। এই চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ হচ্ছে

পুঁজিগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। মার্কস বলেছেন, 'ধারণা হিশাবেই প্রতিযোগিতা পুঁজির অন্তর্নিহিত স্বভাব ছাড়া অন্য কিছু নয়, এটা হচ্ছে পুঁজির অনিবার্য চরিত্র, বহু পুঁজির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটে" (গ্রুনড্রিসে ঃ ৪১৪)।

এই প্রতিযোগিতামূলক স্বভাব পুঁজির অন্তর্নিহিত চরিত্র হিশাবে বুঝতে না পারার কারণে অনেকেই পুঁজির চরিত্র সম্পর্কে বুর্জোয়া বিভ্রান্তিতে ভোগে। এটা সবারই জানা যে, পুঁজির প্রাথমিক বিকাশের পর্যায়ে এর চরিত্র ছিলো প্রতিযোগিতামূলক, কিন্তু দ্রুত সে পর্যায় পার হয়ে পুঁজি একচেটিয়ার যুগে প্রবেশ করে। বুর্জোয়া শ্রেণীও পুঁজির এই পর্যায়কে শনাক্ত করে। বাইরের দিক থেকে দেখলে পুঁজির সঙ্গে পুঁজির তখন দাম নিয়ে প্রতিযোগিতা হয় না বটে কিন্তু প্রতিযোগিতার স্বভাব পুঁজি কখনোই পরিত্যাগ করে না। তার প্রকাশ ঘটে ভিন্নভাবে। অনেকেই কখনোই একচেটিয়াকে ব্যাখ্যা করে প্রতিযোগিতাহীনতা হিশাবে একচেটিয়া পুঁজি সর্বহারা শ্রেণীর কাছে পুঁজির একটা বিকশিত স্তর। যে স্তরে পুঁজির প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রূপ নিয়ে হাজির হয়। অথচ একচেটিয়া মানে প্রতিযোগিতাহীনতা এই বিভ্রান্তি অনেকের মধ্যেই দেখা যায়।

এই বিভ্রান্তির কারণে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বহু আন্তরিক বিপ্লবী কর্মীর মারাত্মক ভুল ধারণা আছে। তারা বুঝতেই পারে না পুঁজি কী করে একদিকে একচেটিয়া রূপ পরিগ্রহণ করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার ধর্মকেও বজায় রাখে। পুঁজির প্রতিযোগিতামূলক স্বভাবের প্রকাশ তখন অন্যভাবে ঘটে। লেনিনের ভাষা অনুযায়ী একদিকে ঘটে "উৎপাদনের সমাজীকরণের অপরিমেয় অগ্রগতি। বিশেষত টেকনিক্যাল উদ্ভাবন ও উন্নতির প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে সমাজীকৃত। (সাম্রাজ্যবাদ ঃ ৩০)। কারণ বিভিন্ন পুঁজি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেয় পণ্যের দাম দিয়ে নয়, অনবরত. উৎপাদন-ব্যবস্থায় কৃৎকৌশলগত উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন করে। এর ফলে "সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পুঁজিবাদ উপনীত হয় উৎপাদনের একেবারে সর্বাঙ্গীণ সমাজীকরণের মুখোমুখি, বলতে গেলে পুঁজিপতিদের ইচ্ছা ও চেতনার বিরুদ্ধেই এটা তাদের টেনে নিয়ে আসে কোনো একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থায়, যা পরিপূর্ণ অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে পরিপূর্ণ সমাজীকরণে উৎক্রমণশীল" (সাম্রাজ্যবাদ ঃ ৩১)।

বলাবাহুল্য যে, পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তর মানে একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা লেনিনের ভাষায় "পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়"। উল্লেখযোগ্য যে, সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যায় কোথাও পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণুতা, পচন বা মুমূর্ষুতার একদেশদর্শী ধারণা লেনিন দেন নি। পুঁজিবাদ এই অর্থে অবশ্যই ক্ষয়িষ্ণু বা মুমূর্ষু যে "একচেটিয়া হলো পুঁজিবাদ থেকে এক উচ্চতর ব্যবস্থার উৎক্রমণাবস্থা" (সাম্রাজ্যবাদ ঃ ১০৮)। অর্থাৎ এমন এক "পচনপাকা" অবস্থা যখন পুঁজিতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের লক্ষণগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। "একচেটিয়াবৃত্তিই হলো সাম্রাজ্যবাদের গভীরতম অর্থনৈতিক বুনিয়াদ" এই সিদ্ধান্ত থেকে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের পুঁজির অচলতা ও পচন সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ

> "একথা নিশ্চয় যে, টেকনিক্যাল উন্নতির মাধ্যমে উৎপাদন-খরচা কমিয়ে মুনাফা বাড়াবার যে সম্ভাবনা থাকে সেটা পরিবর্তন অভিমুখেই সক্রিয়। কিন্তু একচেটিয়াবৃত্তির যা বৈশিষ্ট্য সেই অচলতা ও পচনের প্রবণতাও কাজ করে যেতে থাকে এবং শিল্পের কোনো কোনো শাখায় কোনো কোনো দেশ কিছু কালের জন্য প্রাধান্য লাভ করে" (সাম্রাজ্যবাদ ঃ ১২১; গুরুত্বারোপ লেনিনের)।

সাম্রাজ্যবাদ মানেই একপেশে ভাবে শুধুমাত্র ক্ষয়িষ্ণু, মুমূর্ষু, পচনশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল একটা ব্যাপার হিশাবে যে অবৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে মার্কস বা লেনিনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কণামাত্র সংশ্রব নেই। এমনকি ওপরের উদ্ধৃতিতে একচেটিয়াবৃত্তির অচলতা ও পচনের বৈশিষ্ট্যকে লেনিন প্রবণতা বলছেন। প্রবণতা শব্দটির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ লক্ষণীয় যা অনেককেই বিস্মিত করবে। কারণ, তার মানে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ স্থায়ীভাবে অচল বা পচনশীল কোনো ব্যবস্থা নয়।

কিন্তু একচেটিয়া পুঁজি সাম্রাজ্যবাদ নামে আখ্যায়িত হলো কেন? ঠিক এখানেই পুঁজির আত্মস্ফীতিপরায়ণতার অন্য এক প্রকাশ আমরা লক্ষ করি। অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত পরিবর্তন ছাড়া পুঁজির আত্মস্ফীতিপরায়ণতা অন্য যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয় তার সাক্ষ্য মেলে। সেটা কী? সেটা

হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে বিশ্বের ভাগবাঁটোয়ারা। পৃথিবীর সকল কাঁচামালের উৎস, বিনিয়োগের ক্ষেত্র, উৎপাদিত পণ্যের বাজারগুলো নিজ নিজ দখলে রাখবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে মরিয়া লড়াই ও যুদ্ধ। এটাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের আক্ষরিক অর্থ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রকাশ্য রাজনৈতিক দিক। মর্মের দিক থেকে যা পুঁজির প্রতিযোগিতামূলক স্বভাব বা আত্মস্ফীতিপরায়ণতার অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মার্কস পুঁজির বিশ্লেষণের কোথাও সাম্রাজ্যবাদ নামক ধারণা প্রবর্তন করেন নি। কিন্তু পুঁজির অন্তর্নিহিত যে স্বভাব তিনি তাঁর অসামান্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন সেই স্বভাবের মধ্যেই পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী পরিণতির বীজ নিহিত। সেটা হচ্ছে পুঁজির আত্মস্ফীতিপরায়ণ চরিত্র, যার অভিপ্রকাশ হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাম্রাজ্যবাদী পরিণতি কী রূপ পরিগ্রহণ করে তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ বিশ্লেষণ হাজির করেছিলেন লেনিন। তাঁর বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো সাম্রাজ্যবাদের যুগে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামের নীতি কী হবে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া। আশ্চর্য যে, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষার ছিটেফোঁটা আবিষ্কার করাও এখন এক বিশাল গবেষণার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুঁজির আত্মস্ফীতিপরায়ণ ধর্ম অনুধাবন করার অপরিসীম গুরুত্ব আমাদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই ধর্মের কারণে পুঁজিতে পুঁজিতে যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয় তার ফলাফলটা উৎপাদন ব্যবস্থার দিক থেকে হয় বৈপ্লবিক। প্রতিযোগিতার চাপে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থায় অনবরত বৈপ্লবিক বদল না ঘটিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না (ইশতেহার ঃ ৩৬)। একচেটিয়া স্তরে এসে তার এই বৈপ্লবিক দিক মোটেও হ্রাস পায় না, বরং আরো তীব্রভাবে বাড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে তার অসহনীয় শোষণ ও ধ্বংসাত্মক চরিত্রের দিকটাও। ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য পুঁজিতে পুঁজিতে শুরু হয় মরিয়া লড়াই। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজির সঙ্গে শ্রমের সংগ্রাম সে কারণে আরো তীব্র এবং আরো সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে।

৩। পুঁজির দুনিয়াজোড়া ব্যাপ্তি এবং তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক' পুঁজি

পুঁজি যে সামাজিক সম্পর্ক সে কথা ব্যাখ্যার সময় আমরা একজন চাষী এবং একজন তাঁতীর উদাহরণ দিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম যেহেতু তারা উৎপাদন করছে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, উৎপাদনের দিক থেকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে, সে কারণে একই গ্রামের বাসিন্দা হোক আর দুই মহাদেশে ছড়িয়ে থাকুক তারা, তাতে আমাদের বিশ্লেষণের কোনো হেরফের হবে না। এ কথাটা আমরা বলে রেখেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার জন্য। তা হচ্ছে উৎপাদনের পর তার বিনিময়ের মাধ্যমে যে সামাজিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সমাজটার ব্যাপ্তি কতো বড়ো? এটা কি একটা গ্রামের সীমানার মধ্যে শেষ? নাকি দেশের ভূগোলে? না কি এই সমাজ ছড়ানো সারা দুনিয়ায়?

চাষী আর তাঁতীর উৎপন্ন পণ্যের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগে তারা নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো সমাজ থেকেই তাদের উৎপাদন সম্পন্ন করেছে। সেটা তাদের পুরনো সমাজ। পণ্যোৎপাদন ও পণ্যের বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাহলে গড়ে উঠছে আরেকটি নতুন সমাজ। আমাদের অতএব ভাবতে হচ্ছে সমাজের কথা ঃ একটা পুরনো আর একটা নতুন।

এটা স্পষ্ট যে পুরনো গোষ্ঠী-সমাজগুলোর গণ্ডি ছিলো ক্ষুদ্র—মানুষ বসত স্থাপন করেছে ছোট ছোট ভূখণ্ডে। বাইরে থেকে অনেক সময় অনেককে একই ভূখণ্ডের অধিবাসী হিশাবে দেখা যায় বলে উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে তাদের একই সমাজের বাসিন্দা ভাবা ভুল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সমষ্টি নিয়েই এক একটি ভূখণ্ড, প্রাচীন কালে এটাই ছিলো স্বাভাবিক নিয়ম। এক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রাম-গোষ্ঠীগুলো ভালো একটা উদাহরণ হতে পারে, যে গ্রামগুলোর অস্তিত্বকে মার্কস বলেছিলেন উদ্ভিদের মতো—মাটিতে শেকড় গেঁড়ে হাজার হাজার বছর ধরে অনড় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা যাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। (যদিও মার্কসের এ কথা নিয়ে অনেকে আপত্তি তুলেছেন) তারা প্রত্যেকেই ছিলো পরস্পর থেকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে হলেও—অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা আসলে ছিলো বিচ্ছিন্ন-গ্রাম-গোষ্ঠী।

আমরা যদিও একজন তাঁতী আর একজন কৃষককে উদাহরণ হিশাবে নিয়েছি, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পুরনো গোষ্ঠী সমাজের দিক থেকে দেখলে তারা সমাজ বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ কেউ নয়। নিজ নিজ সমাজের শ্রম সম্পাদনের পরিমণ্ডলের সঙ্গে তারা যুক্ত। অতএব তাদের মধ্যে বিনিময় মানে দুই পুরনো সমাজের মধ্যে বিনিময়। মার্কস তাই সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, যদিও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে আমরা দুই ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় হচ্ছে দেখতে পাই বিনিময় আদিতে সংঘটিত হতে পেরেছে সবসময়ই দুটো ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে—পৃথিবীর কোনো দেশ বা কোনো ভূখণ্ডে তাদের অবস্থান সেটা আলোচনার জন্য আপাততঃ অপ্রাসঙ্গিক। সারকথা হচ্ছে বিনিময় শুরু থেকেই ছিলো আন্তঃসামাজিক বা গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর। বাংলাদেশের চাষীর সঙ্গে বিলাতের তাঁতীর উৎপন্ন পণ্যের যদি কোনো বিনিময় হয় তাহলে নতুন যে সামাজিকতা প্রতিষ্ঠিত হলো সেটা হচ্ছে দুনিয়া-জোড়া সামাজিকতা। পুরনো সমাজের অভ্যন্তরে থেকে নতুন সমাজের আবির্ভাব শুরু থেকেই সারা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক রচনায় সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

> "ভিন্ন ভিন্ন সমাজ নিজ নিজ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজেদের উৎপাদন ও ভোগের উপায় আবিষ্কার করে। সে কারণে তাদের উৎপাদিত পদ্ধতিতে, জীবনযাপনের ধরনে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্নতা ঘটে। এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত ভিন্নতা বিরাজমান থাকার কারণে বিভিন্ন সমাজ যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে একটির সঙ্গে আরেকটির বিনিময় সম্পাদিত হয়, ফলে এইসব দ্রব্য ক্রমশ পণ্যে রূপান্তরিত হয়। বিনিময় উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগগুলোতে ভিন্নতা আনে না, বিনিময়ের কাজ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন বিভাগগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেওয়া এবং যেভাবে তাদের কমবেশি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সামগ্রিক সামাজিক উৎপাদনের শাখায় রূপান্তরিত করা।" (পুঁজি, প্রথম খণ্ড, ৪৭২)।

পণ্যের বিনিময়টা কোথায় সংঘটিত হয়? বাজারে অবশ্যই। পণ্যোৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে দ্রুত এক বিশ্ববাজারের সৃষ্টি হয়। আমরা

এর আগে পুঁজির আত্মস্ফীতিপরায়ণ স্বভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। এই স্বভাবের কারণে পুঁজি কেবলি নিজের বিচলন চক্রের সম্প্রসারণ অর্থাৎ বিনিময়ের সম্প্রসারণ ঘটাবার তাগিদ বোধ করে (গ্রুনড্রিসে ঃ ৪০৭)। সে জন্য মার্কস বিশ্ববাজারের গড়ে ওঠাটাকে পুঁজির স্বভাব থেকেই জাত মনে করতেন। কারণ, "পুঁজির ধারণার মধ্যেই বিশ্ববাজার সৃষ্টির তাগিদ খচিত" (গ্রুনড্রিসে ঃ ৪০৮)।

বিশ্ববাজার গড়ে উঠবার যে পর্যায়টা বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস বোঝার জন্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুগ। পুঁজির তখন উঠতি বয়েস। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসায়ী পুঁজির একটা ঐতিহাসিক রূপ। তাদের মাধ্যমে যখন পণ্যপুঁজির বিচলন শুরু হয়েছিলো তখন ইংল্যান্ড পুঁজিতন্ত্র পাকাপাকি ভাবে আসে নি, আসবার সম্ভাবনা শুরু হয়েছে মাত্র। আর ভারতে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে পণ্যের কারবার সেই তুলনায় বিকশিত ছিলো না। যদিও জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদের মতো কারবারীদের কথা আমরা জানি।

যেটা আমাদের বোঝার বিষয় তা হচ্ছে বিনিময় দুনিয়াজোড়া ব্যাপ্ত নতুন উৎপাদন সম্পর্কের বা নতুন এক সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু তার জন্য আগে থেকেই বিশ্ববাজারে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। সেটা ঘটেছে পরে। আমরা পুঁজির সরলতম রূপেও দেখেছি পুঁজি নিজেকে নিজে স্ফীত করে, এটাই তার ধর্ম, উৎপাদন থেকে বাড়তি মূল্য আত্মসাৎ করবার মতো সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করবার আগে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে তার আত্মস্ফীতির ধরনটা স্রেফ লুটতরাজ বা লুণ্ঠনের অধিক কিছু ছিলো না। বাণিজ্যের সারকথা হচ্ছে কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি। একটি সমাজে একটি পণ্যের মূল্য কমবেশি সবার জানা থাকে, অতএব আর্ন্তসামাজিক বা বিশ্বজোড়া বাণিজ্য ছাড়া মোটা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। বেশি মুনাফা লাভের উপায় ও পথ হচ্ছে দুটি ভিন্ন ও পরস্পরের অপরিচিত সমাজে পণ্যের আদান-প্রদানে নিয়োজিত থাকা। বিনিময় দুনিয়া ব্যাপী সক্রিয় হয়ে ওঠার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে এক সমাজের পণ্য অন্য একটি সমাজে বেশি দামে বিক্রির সুবিধা। যেহেতু একটি সমাজ অপরিচিত অন্য একটি সমাজের উৎপন্ন পণ্যের দাম সম্পর্কে অবগত থাকে না সেই কারণেই এই সুবিধা।

উৎপাদন থেকে নিজেই বাড়তি মূল্য আত্মসাতের সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করবার যে যুগ—অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর্যায় পুঁজির উদিত হবার বা আবির্ভূত হবার পর্যায় থেকে আলাদা। পুঁজির বিকাশ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসের দিক থেকে এই দুটো পর্যায়কে অবশ্যই আলাদাভাবে গণ্য করতে হবে। এ দুটো পর্যায়কে মার্কস আলাদা করে দেখছেন এভাবেঃ

> "পুঁজির হয়ে ওঠার, উন্মেষিত হবার কারণ আর পূর্বশর্তগুলোর যথার্থ মানে হচ্ছে পুঁজি এখনো অস্তিত্ব লাভ করে নি, হয়ে উঠছে কেবল, এগুলো (হয়ে ওঠার কারণ ও পূর্বশর্ত) সত্যিকারের পুঁজি আবির্ভূত হবার পর আর থাকে না; পুঁজি শর্তগুলো নিজেই নিজের অস্তিত্বের ভিত্তিতে নিজেকে বাস্তবায়িত করার শর্তগুলো নিজেই তৈরি করতে সক্ষম। যেমন: মুদ্রা বা মূল্য যে প্রক্রিয়ায় প্রথমে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় পুঁজিওয়ালার দিক থেকে এ রূপান্তরের পূর্বশর্ত হচ্ছে সঞ্চয়—সম্ভবত সঞ্চয়টা ঘটেছে নিজের খাটুনির ফসল হিশাবে, যে খাটুনিটা সে অপুঁজিওয়ালা হিশাবেই খেটেছে। অর্থাৎ যেসব পূর্বশর্তের কারণে মুদ্রা পুঁজিতে পরিণত হয় সেসব পূর্বশর্তের আবির্ভাব ঘটে আরোপিত শর্ত হিশাবে, পুঁজির উন্মেষের প্রয়োজনে এ হচ্ছে পুঁজির বাইরে উদ্ভূত পূর্বশর্ত—সে যাই হোক, পুঁজি যখন পুঁজি হয়ে ওঠে তখন সে নিজেই নিজের পূর্বশর্ত তৈরি করে নেয়, অর্থাৎ বিনিময় না করেও নিজস্ব উৎপাদনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নয়া মূল্য উৎপাদনের আয়োজনগুলো নিজের অধিকারে নিয়ে আসে (গ্রুনড্রিসে ঃ ৪৫৯)।

বিশ্ববাজার একসময় পুঁজি হয়ে উঠবার জন্য শর্ত সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববাজার ছাড়া পুঁজি উন্মেষিত হতে পারতো না। যেমন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ভারতবর্ষসহ নানান এলাকাকে একসময় সম্পৃক্ত করেছে বিশ্ববাজারের সঙ্গে, যে বাজার ছাড়া ইংল্যান্ড পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক বিকাশ লাভ করতে পারতো না। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস বাণিজ্য, লুটতরাজ ও লুণ্ঠনের ইতিহাস। সেটা ইতিহাসের একটা দিক। নির্মম ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন, দুনিয়াজোড়া এক নতুন উৎপাদনব্যবস্থার শর্তও তৈরি করেছিলো, যে ব্যবস্থা বিকৃত হয়ে

চলেছে সারা দুনিয়াজোড়া। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে প্রথমে ইংল্যান্ডে, ঐতিহাসিক কারণে ভারতে তার উন্মেষ ঘটে নি। যার কারণ, বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠার আগে দুটো সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিন্নতা এবং পরবর্তীতে দুনিয়াজোড়া সক্রিয় পুঁজির সঙ্গে পুরনো উৎপাদনব্যবস্থার সংঘাত ও সমঝোতার সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক। তদুপরি ঔপনিবেশিক শাসন। পুঁজির বিকাশ সবসময়ই অসম। পুঁজি পরিগঠিত হয়ে উঠবার পর বিশ্ববাজারকে নিজের অধীন করে ফেলে। যেটা আমাদের অনুধাবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে একবার বিশ্ববাজার পুঁজির জন্মকারণ হিশাবে ভূমিকা পালন করে আবার অন্যদিকে পুঁজির জন্মলাভের পর বিশ্ববাজারকে সম্প্রসারিত ও প্রসারিত করে তোলে পুঁজি নিজে। নিজের আত্মস্ফীতি ও পুঞ্জিভবন-প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিশাবে বাণিজ্যে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর

> "বিশ্ববাজার নিজে এই উৎপাদন ব্যবস্থার (অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার) ভিত্তি হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এই উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অনিবার্য উৎপাদনকে ক্রমাগত বিস্তৃত করে তোলার প্রবণতার বিশ্ববাজারকে কেবলি প্রসারিত করে তোলে, ফলে এদিক থেকে শিল্পোৎপাদনের বৈপ্লবিক রূপান্তর বাণিজ্যের কারণে সাধিত হয় না। বরং শিল্পোৎপাদনেই বাণিজ্য ক্রমাগত বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে থাকে। (পুঁজি তৃতীয় খণ্ড ঃ ৩৩৩)

এটা অতএব স্পষ্ট, পুঁজি যে পরিমণ্ডল থেকে জন্মলাভ করেছে তার বিস্তৃতি ছিলো দুনিয়াজোড়া। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার উদ্ভবের পর পুঁজির এই দুনিয়াজোড়া পরিমণ্ডল সংকুচিত হওয়াতো দূরের কথা বরং ক্রমাগত বিস্তৃত হয়ে চলেছে। নিজের উদ্ভবের পর থেকেই সারা পৃথিবী পুঁজির আত্মস্ফীতি ও পুঞ্জিভবনের ক্ষেত্র। মার্কস এ কারণেই পুঁজির উদ্ভবকে বিশ্ব-ঐতিহাসিক ঘটনা হিশাবে গণ্য করতেন। পুরনো সমাজ ভেঙ্গে দুনিয়াজোড়া নয়া উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে তার ব্যাপ্তিও দুনিয়াজোড়া হতে বাধ্য।

পুঁজির এই দুনিয়াজোড়া ব্যাপ্তিকে বোঝাবার জন্য "আন্তর্জাতিক" শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়। যেমন, বলা হয় পুঁজি আন্তর্জাতিক। বর্ণনামূলক অর্থেই আন্তর্জাতিক শব্দের এই ব্যবহার। পুঁজির দুনিয়াব্যাপী

বিচলন এবং আত্মস্ফীতি ও পুঞ্জিভবনের দুনিয়াজোড়া পরিসর বর্ণনার জন্যই আন্তর্জাতিক শব্দটির চল হয়েছে। কিন্তু শব্দ কেবল বর্ণনাত্মক নয়, প্রতিটি শব্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ধারণাও নিহিত থাকে। সেই ধারণা সম্পর্কে সচেতন না থাকলে বর্ণনামূলক অর্থে এই শব্দের ব্যবহার মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। "আন্তর্জাতিক" শব্দটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্কবাচক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন জাতিতে জাতিতে বা এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হিশাবে আখ্যায়িত। আবার, তার ঠিক উল্টো একটা মানেও আছে এই শব্দের ঃ যার কোনো দেশ নেই বা জাতি নেই সেই হচ্ছে আন্তর্জাতিক। দেশ বা জাতি হিশাবে নিজের সংকীর্ণ পরিচয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সারা পৃথিবীর সকল মানুষের হয়ে সর্বজনীন চেতনার ধারণ ও চর্চা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। সর্বহারা শ্রেণী ঠিক এই অর্থেই আন্তর্জাতিক। কিন্তু এটা আন্তর্জাতিকতার ইতিবাচক অর্থ। এর নেতিবাচক অর্থও প্রবলভাবে প্রচলিত রয়েছে। যেমন, বহুজাতিক মুনাফাকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিকতা। বলা হয়ে থাকে মুনাফার জন্য হেন কোনো কাজ নেই যা তারা করে না। বহুজাতিক মানে বহুজাতির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয়, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কায়কারবার দুনিয়াজোড়া বিস্তৃত—সে অর্থেই তারা বহুজাতিক। এক্ষেত্রে বহুজাতিকতা আন্তর্জাতিকতারই সমার্থক কারণ আন্তর্জাতিক কায়কারবার বোঝাতেই এক্ষেত্রে বহুজাতিকতা শব্দটি ব্যবহাত হয়।

'আন্তর্জাতিক' শব্দটি পুঁজির বিশেষণ হিশাবে অনেকে শেষের নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করে ফেলেন। অর্থাৎ তাঁরা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকেই পুঁজির একমাত্র রূপ হিশাবে ধরে নেন। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ক্ষতিকর তৎপরতার কারণে এই ধারণা গড়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখা উচিত বহুজাতিক কোম্পানি পুঁজির একমাত্র বহিঃপ্রকাশ নয়। লেনিনের কথামতো সাম্রাজ্যবাদ যদি পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায় হয়ে থাকে তাহলে পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বহিঃপ্রকাশগুলোর একটা হিশাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে বিচার করাই বিজ্ঞানসম্মত। পুঁজিকে দ্বান্দ্বিক সমগ্রতায় অনুধাবন করতে হলে তার ঐতিহাসিক লক্ষ্যের দিককে খেয়ালে রাখতে হবে। বুঝতে হবে পুঁজির বিশ্ব-ঐতিহাসিক চরিত্রের সামগ্রিক দিকটা কী! উৎপাদনের দুনিয়াজোড়া পরিসরের ক্রমাগত বিস্তৃতি ঘটিয়ে পুঁজি পৃথিবীর সকল

বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড, দেশ বা গোষ্ঠীকে নিয়ে আসছে বিশ্ববাজার ও দুনিয়াজোড়া বিস্তৃত পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অধীনে। তারপর নিজের পুঞ্জিভবন এবং আত্মস্ফীতির প্রক্রিয়ায় এমন এক নতুন সমাজের ভিত্তি সৃষ্টি করে চলেছে যা বিশ্ব-ঐতিহাসিক। কিন্তু বিকাশের পর্যায়ে কোথাও সে ধ্বংস করেছে, পশ্চাদপদ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলোও ভেঙ্গে পড়ছে ক্রমাগত, ফলে পরিগঠিত হচ্ছে উৎপাদনের নতুন পরিমণ্ডল, জন্মলাভ ঘটেছে নতুন জাতির, নতুন জাতীয়তাবোধের, নতুন রাষ্ট্রের; ওলোটপালোট ঘটছে রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সীমানায়। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ নতুন নতুন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাগিয়ে তুলছে নিত্যনতুন বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষা ও অগ্রসর চেতনা যার এক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে জাতিগত চেতনা হিশাবে। মনে রাখা দরকার এসকল সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক পরিবর্তন পুঁজির দুনিয়াজোড়া বিকাশের ফলাফল।

পুঁজি পুরনো গোষ্ঠীসমাজকে জাতিগত রূপই কেবল দেয় নি বহু গোষ্ঠীকে পৃথিবী থেকে নিষ্ঠুরভাবে নিশ্চিহ্ন করেছে। নির্মমভাবে ধ্বংস করেছে বহু জাতিসত্তাকে। উত্তর আমেরিকার আদি অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের আজ আর কার্যকর কোনো অস্তিত্বই নেই। তেমনি অস্তিত্ব নেই অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, এশিয়ার বহু আদি অধিবাসীর। বাংলাদেশে উপজাতীয় গোষ্ঠীর ওপর বর্বর নির্যাতন ও বিনাশ সাধনের প্রক্রিয়া চলছে আমাদের চোখের সামনেই—এবং এই ধ্বংসের তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘই হবে। তাই ভারতের বৃটিশ শাসনের ধ্বংস এবং নির্মাণের যুগপৎ প্রক্রিয়ার খতিয়ান টেনে মার্কস বলছেন ঃ

> "ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগটার দায়িত্ব নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা—একদিকে মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ এবং সে যোগাযোগের উপায়; অন্যদিকে মানুষের উৎপাদনী শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্য রূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে যেমন পৃথিবীর উপরিতল গঠিত হয়েছে, তেমনি বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে এক নতুন জগতের বৈষয়িক শর্ত। বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্ব-বাজার এবং আধুনিক উৎপাদনী শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব

আত্মস্থ করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলি জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না" (উপনিবেশিকতা ঃ ৯১-৯২)

'আন্তর্জাতিক' শব্দটি ব্যবহারের বিভ্রান্তিকর দিক এখন আরো স্পষ্ট হবে। আমরা যখন 'আন্তর্জাতিক পুঁজি' বলি আমরা ধরে নিই যে, 'জাতি' পুঁজির আগেই প্রাকৃতিক ভাবে পরিগঠিত হয়ে রয়েছে এবং এ ধরনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক 'জাতি' নিয়েই 'আন্তর্জাতিক' পরিমণ্ডলটা গঠিত। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের অনুবর্তী প্রক্রিয়া হিশাবে জাতিসত্তার বিকাশ বা একটি জাতির হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা আমরা তখন বুঝতে পারি না। তদুপরি পুঁজির বিকাশ যে বিভিন্ন 'জাতি'কে অর্থাৎ প্রাকৃতিক গোষ্ঠীকে নির্মম ধ্বংসের ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য করেছে এবং এখনও করছে ইতিহাসের সেইসব রক্তাক্ত অধ্যায়গুলো আমরা তখন ভুলে যাই। এমনকি পরিগঠিত হবার পরেও প্রতিটি জাতির মধ্যেও অনবরত পুঁজি যে রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে সেটাও 'জাতি' নামক স্থির ধারণার কারণে আমরা বুঝতে পারি না।

জাতির পরিগঠন, বিকাশ, ধ্বংস ও রূপান্তর দুনিয়াজোড়া পুঁজির পুঞ্জিভবন ও আত্মস্ফীতিরই অনুবর্তী প্রক্রিয়া। পুঁজির পুঞ্জিভবন ও আত্মস্ফীতির প্রক্রিয়া থেকে আলাদাভাবে 'জাতি' নামক অনড় ও স্থির কোনো সত্তা বিরাজ করে না। বর্ণনাত্মক অর্থেও অতএব 'আন্তর্জাতিক' শব্দটি পুঁজির বিশেষণ হিশাবে ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে পুঁজির এই দুনিয়াজোড়া পুঞ্জিভবন ও আত্মস্ফীতি বিভিন্ন দেশ কী ধরনের শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে এবং দিচ্ছে তার সঠিক খতিয়ান টানা। ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীই অন্যান্য দেশে অনুসরণ করেছে ঔপনিবেশিক নীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও দমন। ইতিহাসের একটা পর্যায় পর্যন্ত এই শ্রেণীর ভূমিকা ছিলো প্রগতিশীল। কিন্তু পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশের পর থেকে এই শ্রেণীর ভূমিকা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় বিকাশ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য সুস্পষ্টভাবে এই শ্রেণীকে দুনিয়াজোড়া প্রভুত্বের আসন থেকে

উৎখাত করা সর্বহারা শ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নিপীড়িত জাতিসমূহের জাতিসত্তার বিকাশ ঘটেছে এবং ঘটছে। জাতিসত্তা বিকাশের ইতিহাসের দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর পরিগঠন, সচেতনতা অর্জন, সংগ্রাম এবং সংগ্রামের চরিত্র পৃথিবীর সব দেশ কালে একরকম ছিলো না এবং থাকবার কথাও নয়। দুনিয়াব্যাপী পুঁজির পুঞ্জিভবন এবং আত্মস্ফীতির আলোকে এসব বিষয় সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।

পুঁজির দুনিয়াজোড়া পরিব্যাপ্ত চরিত্র বুঝবার জন্য এই আলোচনা আরো সম্প্রসারিত করার আগে এখান থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলোর সারমর্মায়ন জরুরি। বিশেষতঃ পুঁজির বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির চরিত্র অনুধাবন করার ব্যর্থতার কারণে সর্বহারা শ্রেণী নানান বিভ্রান্তিকর শব্দ, ধারণা ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে সহজেই প্রভাবিত হয়। সারমর্মায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে—নিজেদের ভুল চিন্তা ও বিভ্রান্তির নিরসন।

ক বিনিময় মানে সংযোগ নয়, সুনির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক

বুর্জোয়া ধ্যান ধারণার আধিপত্যের কারণে এ চিন্তা প্রায় সবারই মনে বদ্ধমূল যে বিনিময় হচ্ছে দুজন উৎপাদকের মধ্যে সংযোগ। সেদিক থেকে দুটো দেশের মধ্যে বিনিময় মানে দুটো দেশের মধ্যে সংযোগ। দুটো আলাদা বস্তুকে যুক্ত করে দেবার ধারণা হিশাবে সংযোগ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সংযোগ অভ্যন্তরীণ কোনো সংযুক্তি নয়, বাইরেরই একটা ব্যাপার, সেতু দিয়ে খালের একূল ওকূল যুক্ত করে দেবার মতো একটা ধারণা, যার ওপর দিয়ে লোকের বদলে পণ্য আসা যাওয়া করছে। বিনিময়-সংক্রান্ত এ ধারণা অমার্কসীয়।

পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীনভাবে উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই পণ্যকে সামাজিক করে তোলার জন্য বাজারে নিয়ে আসে। কারণ তারা উৎপাদন করে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে। তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সমাজের পণ্য হতে পারে একমাত্র বাজারে বিক্রি হবার পর। কারণ বিক্রির মধ্য দিয়েই সেই পণ্য সমাজের চাহিদা মেটায়। উৎপাদনের জন্য পুঁজিপতি অন্য একজনের কাছ থেকে মেশিনপত্র ও কাঁচামাল কেনে এবং সে অনুপাতে শ্রমিক নিয়োগ করে। অতএব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তা আদতে উৎপাদন

সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের সামাজিক বৈশিষ্ট্যই ব্যক্ত হয়।

আমাদের দেশে প্রস্তুত বলে জানি এমন যেকোনো একটি পণ্যের উদাহরণ দিলে উৎপাদনের সামাজিক বৈশিষ্ট্য—কথাটা স্পষ্ট হবে। পণ্যটি কী করে তৈরি হলো তা খোঁজ নিয়ে দেখলে আমরা দেখবো দুনিয়াজোড়া পরিব্যাপ্ত উৎপাদন সম্পর্কের সকল চিহ্নই পণ্যটির মধ্যে নিহিত। হয়তো এর কাঁচামালের কিছু এসেছে জাপান থেকে, কিছু ভারত থেকে, কিছু বা আমাদের নিজেদের দেশেই তৈরি। যেসব মেশিন দিয়ে বস্তুটি তৈরি তা একটি হয়তো জার্মানির, অন্যটি ইংল্যান্ডের বা আমেরিকার; যে তেল মেশিনগুলো চালানো হয়েছে তার তেল এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। আর পণ্যটির উৎপাদনের জন্য যে শ্রমশক্তি ব্যয় হয়েছে তার উৎস হয়তো বাংলাদেশ, ইত্যাদি।

এই যে উৎপাদনের দুনিয়াজোড়া পরিমণ্ডল বা এক এক দেশে পণ্যটি উৎপাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট শ্রম সম্পাদন—বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শ্রমের এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলোই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আবার কোনো একক পুঁজি এই পণ্যটি উৎপাদন করে নি বরং বিভিন্ন পুঁজি এই পণ্যের মধ্যে জড়াজড়ি করে রয়েছে, বহু পুঁজি এই পণ্যকে কেন্দ্র করে পরস্পরের সঙ্গে নানান ভাবে সম্পর্কিত।

বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এই দুনিয়া জোড়া উৎপাদন সম্পর্ক যে বৈষয়িক ভিত্তির উপর দাঁড়ানো তা হচ্ছে দুনিয়াজোড়া উৎপাদনের শ্রমবিভাগ। বর্ণনাত্মক অর্থে অনেকে এই শ্রমবিভাগকে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগও বলে থাকেন। বিশেষণ হিশাবে 'আন্তর্জাতিক' শব্দটি ব্যবহারের বিপদ এক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরি। আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি যে, উৎপাদন-সম্পর্ক নিজেকে পণ্যের মূল্য বা দামের মধ্য দিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকাশ করে। অতএব বৈশ্বিক-ভৌগলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে উৎপন্ন পণ্যের আন্তর্জাতিক দাম দুনিয়াজোড়া বিস্তৃত উৎপাদন-সম্পর্ককেই ব্যক্ত করে। বলাবাহুল্য যে বৈশ্বিক শ্রমবিভাগ পুঁজির আত্মস্ফীতি ও পুঞ্জিভবনের বৈষয়িক ভিত্তি, অর্থাৎ এটা পুঁজির বাড়তি মূল্য উৎপাদন ও তা আত্মস্থকরণের কাঠামো। পুঁজির পুঞ্জিভবন ও আত্মস্ফীতির সঙ্গে তাল রেখে বিশ্ব-ভৌগলিক শ্রমবিভাগের ক্রমাগত রূপান্তর ঘটতে থাকে।

খ. আন্তর্জাতিক পুঁজি মানে শুধু বিদেশী পুঁজি নয় বা কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় পুঁজি নয়

আমরা ওপরে দেখিয়েছি যে বিনিময় উৎপাদনের বাইরের কোনো ব্যাপার নয়, ফলে বিশ্ববাজার বৈশ্বিক শ্রমবিভাগের বাইরের কোনো সম্পর্ক নয়—এটা মৌলিক ও অভ্যন্তরীণ এক সম্পর্কের অভিব্যক্তি। যার মানে হচ্ছে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের শর্ত দুনিয়াজোড়া ব্যাপ্ত। সে শর্ত বিশ্ববাজারের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্গত। আন্তর্জাতিক বললে সকল শর্তের উর্ধ্বে অবস্থিত যে ধারণা মনে আসে সেটা উৎপাদন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বা পুঁজিকে আন্তর্জাতিক বলার কারণে এসে যায়। ফলে পুঁজিকে মনে হয় সারা দুনিয়ায় ভেসে বেড়ানো একটা কিছু—খোদ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এ ভুল ধারণা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পুঁজি শুধু বিদেশের পুঁজি নয়, দেশীয় পুঁজিও তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সকল দেশের পুঁজিগুলো এটা যোগফল বা সমষ্টি। একজন পুঁজিপতি অন্য পুঁজিপতির কাছ থেকে মেশিনপত্র কেনে বা বিক্রি করে, মজুরি হিশাবে পুঁজির যে অংশ শ্রমিকরা পায় তা দিয়ে তারাও পুঁজিপতিদের উৎপাদিত ভোগ্য পণ্য কেনে। এর মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে যে বাড়তি মূল্য নিহিত থাকে তা বিক্রির মাধ্যমে উসুল হয় এবং নতুন উৎপাদনও শুরু হতে পারে। এটা না হলে পুঁজি টিকে থাকতে পারে না। আষ্টেপৃষ্ঠে পরস্পরের আত্মস্ফীতির প্রক্রিয়ায় সব পুঁজি পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। বাংলাদেশের পুঁজি ঠিক সেভাবেই অন্য দেশের পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কিত। একের আত্মস্ফীতির জন্য অন্যকে তারা ব্যবহার করছে, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউকে ধ্বংস করছে, কাউকে ফাঁপিয়ে তুলছে, আবার কার্টেল ট্রাস্ট, স্টক কোম্পানির মাধ্যমে রূপান্তরিত হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিতে। প্রতিটি স্বাধীন পুঁজি সমাজের এই সামগ্রিক গতিমানতার কর্তা কিন্তু কেউ একক কর্তা নয়। এর সামগ্রিক ফলাফল পুঁজিপতিদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। পুঁজি এমন এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি যার ওপর ব্যক্তি পুঁজিপতির

নিয়ন্ত্রণ নেই, ফলে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার নৈরাজ্য ও সংকট তারা কখনোই নিরসন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক পুঁজি হচ্ছে পুঁজি সমাজের এই পারস্পরিকতার ফলে সৃষ্ট গতি ও প্রক্রিয়া। যেটা আমাদের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক পুঁজি কোনো অখণ্ড আর একক সত্তা নয়। বহু পুঁজির মিলিত সম্পর্ক ও পারস্পরিকতাই দুনিয়াব্যাপী সক্রিয় পুঁজির সামগ্রিকতাকে ব্যক্ত করে। দালাল পুঁজি বা মুৎসুদ্দি পুঁজি নামক কোনো অদ্ভুত পদার্থ নেই। সব পুঁজিই অন্য পুঁজির দালাল বা মুৎসুদ্দি। কারণ অন্য পুঁজির পুঞ্জিভবন ও আত্মস্ফীতির প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পুঁজিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। তবে সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও সহযোগী শ্রেণীকে অবশ্যই রাজনৈতিক অর্থে দালাল ও মুৎসুদ্দি হিশাবে শনাক্ত করতে হবে। যে শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদের যুগে তীব্রভাবে লড়তে হয়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে সর্বহারা শ্রেণীর একাংশও– দালাল বা মুৎসুদ্দিতে পরিণত হয়– লেনিন যাদের–সামাজিক ভণ্ড (Social Chauvinist) আখ্যা দিয়েছিলেন। এরা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুগে নিজ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাতের পরিবর্তে তাদের সঙ্গে হাত মেলায়। উপরন্তু তাদের পক্ষ হয়ে অন্য দেশের বিরুদ্ধে লড়ে।

গ্রন্থসূত্র

ইশতেহার
কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, মার্কস-এঙ্গেলস, প্রগতি প্রকাশন ১৯৮৫
পুঁজি প্রথম খণ্ড
CAPITAL by Karl Mark ; Volume One. Vintage Books, New York 1977
পুঁজি দ্বিতীয় খণ্ড
CAPITAL by Karl Mark ; Volume Two. Vintage Books, New York 1981

পুঁজি তৃতীয় খণ্ড
CAPITAL by Karl Mark ; Volume Three. Vintage Books, New York 1977
সাম্রাজ্যবাদ
সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, ভ ই লেনিন রচনা সংকলন, দ্বিতীয় ভাগ, প্রগতি প্রকাশন
উপনিবেশিকতা
Marx-Engels on Colonialism. University Press of the Pacific. 2001

দ্বিতীয় ভাগ

অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার ভূমিকা

কার্ল মার্কস

অনুবাদ : ফরহাদ মজহার

প্রসঙ্গকথা

মার্কসীয় বিজ্ঞানের ভিত্তি অর্থশাস্ত্র, এ শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ ও আগ্রহ সম্প্রতি বাংলাদেশে বেড়েছে। এটা খুশির কথা। সে আগ্রহ ও মনোযোগকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিতার একটি মৌলিক দায়িত্ব। সে দায়িত্বের কথা মনে রেখে মার্কসের An Inroduction to the Critique of Political Economy রচনাটির তরজমা এখানে প্রকাশ করা হলো। অর্থশাস্ত্রের চর্চা ও অনুশীলনে আশা করি অনুবাদটি সময়োপযোগী হবে। মার্কসের এই রচনাটি ইংরেজীতে Introduction নামেই বেশি পরিচিত। সহজ ও সংক্ষিপ্ত বলে আমরাও একে ভূমিকা নামেই অভিহিত করবো।

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার (১৮৪৮) আর পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (১৮৬৭) প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থশাস্ত্র বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার পাশাপাশি মার্কস নিজের জন্য যে খসড়ানোট তৈরি করেন তা **গ্রুন্ড্রিসা** (Grundrisse) নামে পরিচিত। এ ছিলো **পুঁজি** গ্রন্থের প্রস্তুতিপর্ব। এখানে অনূদিত ভূমিকা 'গ্রুনড্রিসা'রই উপক্রমণিকা।

'গ্রুনড্রিসা'র অর্থ 'ভিত্তি'। শব্দার্থের ব্যাপ্তিকে বাংলায় আরো কাবু করে ধরলে দাঁড়ায় 'মৌলিক লক্ষণ'। ১৮৫৭ থেকে শুরু করে ১৮৫৮র মধ্যে মার্কস এই খসড়া প্রস্তুত করেন। মার্কসের এই খসড়া নোটের পুরো নামকরণ করা হয়েছে 'অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার ভিত্তি'। ইংরেজি ভাষাভাষীরা মূল জর্মান শব্দ Grundrisse নামেই খসড়া- নোটকে অভিহিত করেন। বাংলায় নাম হিশাবে গ্রুনড্রিসা' প্রচলিত হতে কোনো বাধা আছে বলে মনে হয় না।

'গ্রুনড্রিসার বর্তমান ভূমিকা মার্কস লেখেন অগাস্ট মাসের শেষ আর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে। লন্ডনে। কুৎসিত হিম আর

ঠাণ্ডার মরসুম তখন। আর মার্কস নিজদেশ থেকে বিতাড়িত, কপর্দকহীন। অভাবে আর অনটনে সংসার বিপর্যস্ত। অর্থহীন অবস্থায় অর্থশাস্ত্র বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ ও গবেষণার এই বিপুল আয়োজনকে নিষ্ঠুর ঠাট্টা বলে মনে হয়। এই পরিহাসকে পরাস্ত করে সময়ের বিপক্ষে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে কাজ করে যাবার যে চূড়ান্ত নজির মার্কস স্থাপন করে গেছেন তা অসামান্য।

Introduction পুরো তরজমা করলে দাঁড়ায় **অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার একটি ভূমিকা**। 'পলিটিক্যাল ইকনমি' শব্দটির আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ ঠিক অর্থশাস্ত্র নয়। আক্ষরিক সঙ্গতি রেখে অনুবাদ করা হলে দাঁড়ায় 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'। এ অনুবাদের একটা বিপজ্জনক দিক হচ্ছে যে এতে মনে হয় 'অর্থনীতি' নামে আমাদের কাছে যে ব্যাপারটি পরিচিত, বিষয়টি বুঝি বা সেই ব্যাপারেরই অন্তর্ভুক্ত –অর্থাৎ মূলত হিশাবনিকাশ কায়কারবার সামাল দেয়ার জন্যে মুদীদোকানের হালখাতার গোনাগুনি। তফাতটা কেবল এই যে, মুদীদোকানটা পরিচালিত হয় সম্ভবত রাজার নির্দেশে, বা রাজার তরফে রাষ্ট্রের। অর্থনীতির যে অবস্থা এদেশে তাতে এরকম ধারণা মাথা গেঁড়ে বসলে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার উপায় থাকে না। তবে বুর্জোয়া 'অর্থনীতি'কে ঢালাওভাবে মুদীদোকানের চিরকুট বলার ধৃষ্টতা নেহায়েত বেয়াদবি। বিশেষত আলীশান কম্পিউটার, গণিত ও সংকেতের বিপুল কসরতকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। মুদী কি আর এসব ব্যবহার করে? কথা হচ্ছে, চিন্তার ব্যাপ্তি আর বাস্তবকে পর্যবেক্ষণের ক্ষমতার কথা ধরলে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র আর আধুনিক অর্থশাস্ত্রের দূরত্ব বিস্তর। এ বিষয়ে রবার্ট হেইলব্রোনারের একটা মন্তব্য তুলে দিয়ে আমরা আপাতত স্থানাভাবের জন্য খালাস হতে চাই। রবার্ট অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা ও তত্ত্বের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ। এ কাজে তিনি প্রথম সারির একজন বলে গণ্য। তাঁর কথা বুর্জোয়ারাও ফেলনা মনে করেন না। তিনি বলছেন ঃ

> 'বিগত পঞ্চাশ বছরের বিশ্লেষণশৈলিতা সত্ত্বেও আমি অর্থনীতির এই আধুনিক অধ্যায়ে গভীরতা-ব্যাপ্তি কিছুই আবিষ্কার করতে পারি না, যাতে এই অধ্যায়কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের স্তর থেকে উঁচুতে স্থান দেয়া যায়। আধুনিক অর্থনীতির এই যুগটি উর্বরতায় অপূর্ব এবং মেধাবী। কিন্তু আমি মনে করি না একে একটি মহা-যুগ আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

–Robert Heilbroner in Modern Economics as a Chapter in the History at Economic Thought : Political Economic at the New School : NSSR 1980, P-6

অর্থনীতি বলতে আমাদের বোধেবুদ্ধিতে যা জারি হয়ে রয়েছে তার থেকে গুণগত তফাত বজায় রাখার জন্য পলিটিক্যাল ইকনমির অনুবাদ অর্থশাস্ত্র হোক এ যুক্তিকে যথেষ্ট বলে গণ্য করা যায় না। অবশ্য একথা সত্যি যে, ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের ব্যাপ্তি ও গভীরতা 'শাস্ত্র' শব্দটির ভেতর যতোখানি ব্যক্ত 'নীতি' কথাটির ভেতর ততোখানি নয়। সে যাই হোক, প্রচলিত অর্থনীতির বিষয় আর পলিটিক্যাল ইকনমির বিষয়ে পার্থক্য আছে। যে বিজ্ঞান একটি সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনকে নিজের বিষয় হিশাবে গণ্য করে এবং সামাজিক সম্পর্ক, সম্পর্কের বিভিন্ন অভিব্যক্ত রূপ—যেমন আইন, সংস্কৃতি, মতাদর্শ প্রভৃতির উদ্ভব ও রূপান্তর বিচারকে সেই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে, পলিটিক্যাল ইকনমি সে বিজ্ঞানের সমমর্মী। এই যুক্তিতে পলিটিক্যাল ইকনমিকে অর্থশাস্ত্র আখ্যা দিয়ে প্রচলিত অর্থনীতি থেকে দূরত্ব সূচিত করে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থশাস্ত্র যা জানতে চায়, অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের যা বিষয়, তা যে অর্থনীতির বিষয় থেকে পৃথক, জ্ঞানের মানচিত্রে তাকে কম্পাস কষে দাগ দিয়ে রাখলে বিজ্ঞানেরই উপকার।

তবে অর্থশাস্ত্রে তো পলিটিক্যাল শব্দটি ধরা পড়ছে না। তার দরকার নেই। শব্দটির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আদতে অর্থশাস্ত্র নামক বিচার বিশ্লেষণের যখন উদ্ভব হয় তখন তার বিষয় ছিলো পরিবারের সদস্যদের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়োজনে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম-পর্যালোচনা। অর্থাৎ, পরিবারের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ছিলো এর বিষয়। Economy বা Oeconomy-র এটাই হলো আদত অর্থ। সমস্ত পরিবার, অর্থাৎ পুরো সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি যখন প্রসারিত করা হলো তখন পরিবার থেকে সমাজের তফাত বজায় রাখার জন্য বিশেষণ যোগ করে বলা হলো Political Economy। নাগরিক সামাজের ভেতর সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তর-পার্থক্য তীব্রতর হবার আগের ঘটনা এইসব। অর্থাৎ যা রাজনৈতিক সত্তা তাই সমাজের সদস্যদের কাছে সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তা হিশাবে পরিগণিত। অতএব যে সময় এই শাস্ত্রের উদ্ভব তখন থেকেই একে পরিবারের বিপরীতে সমাজের সার্বিক মঙ্গলের—অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন

মেটানোর কানুন হিশাবে পরিগণনা করা হয়েছে। জন্মের ঐতিহাসিক চিহ্ন শব্দের গায়ে থেকে যায়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এখন জন্মের ইতিহাসটি মনে রেখে জন্মচিহ্ন বহন করে বেড়ানোর ভার থেকে পলিটিক্যাল ইকনমিকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। অন্তত অনুবাদে। তাই রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র না করে স্রেফ অর্থশাস্ত্র হয়েছে। বর্তমান অনুবাদে নিউইয়র্কের 'ভানটেজ বুকস' কর্তৃক প্রকাশিত ও মার্টিন নিকলস কর্তৃক অনূদিত গ্রুনড্রিসার ১৯৭৩ সনের সংস্করণ অনুসরণ করা হয়েছে (পৃঃ ৮৩-১১১)। নিকলস দাবি করেছেন যে, ইংরেজী অনুবাদে তিনি মার্কসের বাক্য বিন্যাসের ধরন এবং মাঝে মধ্যে অস্পষ্ট হলেও জর্মান শব্দের কাঠিন্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। বক্তব্য সহজ করে আনার জন্য আরো মসৃণ ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু বর্তমান অনুবাদটি খোদ জর্মান ভাষা থেকে হচ্ছে না, অতএব জর্মান ভাষার কাছাকাছি ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণ করাই বোধ হয় সঙ্গত হয়েছে।

তবে বাংলা অনুবাদের বর্তমান প্রচেষ্টায় বিষয়ের জটিলতাকে প্রাধান্য দিয়েও যথাসম্ভব বক্তব্য সরল করে আনার দিকেই ঝোঁক ছিলো বেশি। ফলে বাক্য গঠনে হেরফের হয়েছে মাঝেমধ্যে, কিছু শব্দও আমদানি করা হয়েছে, জটিল বাক্যকে ভেঙে দুটো সরল বাক্যে সহজ করে আনারও প্রয়োজন পড়েছে। কিন্তু এসবই করা হয়েছে মূল ভাষ্যকে সঠিক রেখে, অর্থবিচ্যুতি না ঘটিয়ে। ভবিষ্যতে যারা খোদ জর্মান থেকে অনুবাদ করবেন বা আরো ভালো অনুবাদের চেষ্টা করবেন তাঁরা আশা করি সেই উৎকর্ষ দেখাবেন যাতে মূলপাঠের সঙ্গে বাংলা গদ্যের একটা সমীকরণ ঘটানো যায়।

পরিভাষা প্রসঙ্গে কিছু কথা বলে রাখা দরকার। Category-র একটা পারিভাষিক অনুবাদ চালু আছে, তা হলো 'বর্গ'। এ অনুবাদে পরিপূর্ণ দার্শনিক দ্যোতনা পরিস্ফুট নয় বলে বোধ হয়। কারণ বোধ করি 'বর্গ' শব্দটি যান্ত্রিক অনুবাদ, ফলে আপনকার মর্মার্থ পাঠকের মধ্যে প্রাণিত করতে অক্ষম, ব্যবহার হলে শব্দের অস্ত্রোপচার বলে মনে হয়। যাহোক, এ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়। সম্ভবত সবচেয়ে উৎফুল্লের হতো 'সংজ্ঞা' শব্দটি ব্যবহার করা গেলে, কিন্তু Defintion-এর অনুবাদে ব্যবহার হয়ে হয়ে এর দ্যুতি প্রায় বিনষ্ট। বিকল্পে প্রাত্যয়িক 'সংজ্ঞা' সাব্যস্ত হয়েছে, তবে একে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হিশাবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

Concrete-এর অনুবাদ শুধু মূর্ত না রেখে মূর্তসত্য রাখা হয়েছে শব্দটির সদর্থবাচক ইংগিত ফুটিয়ে তোলার জন্য। মূর্ত বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যখন পূর্ণ প্রাত্যয়িক অভিধা লাভ করে তখন তা 'মূর্তসত্য'। তার আগে সে অভিজ্ঞতার স্থান নেহায়েত উপলব্ধির পর্যায়ে। এ দুই অসম স্তরের পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন হেগেল, মার্কস কোথাও তা অস্বীকার করেন নি। তবে অভিজ্ঞতায় উপলব্ধ সত্তা চিন্তার যে রূপ নিয়ে মূর্তসত্যে প্রণীত হয় সেই রূপই বাস্তব– হেগেলের এই প্রস্তাব মার্কসের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সত্যিকারের বাস্তব আর সত্যিকারের বাস্তবকে চিন্তা নিজের ভেতর যেভাবে প্রণয়ন করে নেয় সে দুয়ের ভেতর পার্থক্য আছে, অভেদ নেই। তবে মার্কস বলছেন চিন্তা বাস্তব জগৎকে নিজের মধ্যে মূর্তসত্যে প্রণীত করেই কেবল জানে, সত্যতা নির্ণয় করে।

Need কথাটির ভেতর ইচ্ছার যে অভিব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিক তৎপরতা যেনো লুপ্ত না হয়, তার জন্য অনুবাদে 'আকাঙ্ক্ষা' ব্যবহার হয়েছে—'প্রয়োজন' নয়।

ভবিষ্যতে আরো পরিমার্জনার জন্য অনুবাদের সমালোচনা আমাদের কাম্য।

ফরহাদ মজহার
বৈশাখ, ১৩৮৯

উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ
বিনিময় (বিচলন)

(১) উৎপাদন

স্বা ধী ন ব্য ক্তি : আ ঠা রো-শ ত কী য় চি ন্তা ভা ব না

যে বিষয় আমাদের সামনে, যা দিয়ে আমাদের আলোচনার শুরু, তা হচ্ছে-বস্তুগত উৎপাদন।

সমাজে উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তি—অতএব, সামাজিকভাবে নির্ণীত ব্যক্তিগত উৎপাদন হচ্ছে আলোচনার আরম্ভ, এখান থেকেই আমাদের প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে। ব্যক্তি, অর্থাৎ সমাজবিচ্ছিন্ন শিকারি আর জেলে—যাদের নিয়ে স্মিথ আর রিকার্ডো শুরু করেন, তারা আসলে আঠারো-শতকীয় পাণ্ডুর কল্পনার রবিনসন ক্রুসো মার্কা উদ্ভট সৃষ্টি [১]। এ কল্পনা মোটেও অতিজটিল জীবনের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ভুলবোঝা প্রাকৃতিক জীবনে ফিরে যাবার অভিব্যক্তি নয়, যা কিনা সংস্কৃতিবিদ-ঐতিহাসিকদের ধারণা। এমনকি প্রাকৃতিকভাবে স্বাধীন স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তি—রুশো তাঁর **'সামাজিক চুক্তি'** গ্রন্থে যাদের পারস্পরিক চুক্তিতে সম্পর্কায়িত ও যুক্ত করেছেন— তার সঙ্গেও এ কল্পনার সাযুজ্য অল্পই। রবিনসন ক্রুসো-মার্কা ছোট বড়ো উদ্ভট চিন্তাভাবনার সঙ্গে এসব হচ্ছে আপাত সাদৃশ্য—নেহায়েতই একটা নান্দনিক সাযুজ্য। এ হচ্ছে বরং 'নাগরিক সমাজের' পূর্বাভাস, যার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিলো ষোল শতকে এবং আঠারো শতকে এসে এক লাফে যা উন্নীত হয়েছে পরিণত পর্যায়ে। অবাধ প্রতিযোগিতায় আচ্ছন্ন এই সমাজে মানুষের অভ্যুদয় ঘটলো যাবতীয় প্রাকৃতিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, যেসব বন্ধন তাকে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ একদল মানুষের আনুষঙ্গিক অংশে পরিণত করে রেখেছিলো।

স্মিথ আর রিকার্ডো দুজনেই সেইসব আঠারোশতকী পয়গম্বরদের ঘাড়ের ওপরে দুই পা চাপিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যাদের চিন্তায়

আঠারোশতকী ব্যক্তি এক আদর্শ উদাহরণ হিশাবে আবির্ভূত—যে ব্যক্তি একদিকে সামন্ত সমাজের বিলুপ্তি অন্যদিকে ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে ক্রমবিকশিত উৎপাদন শক্তির ফলশ্রুতি; এই উদাহরণ অতীতেও তাঁরা প্রক্ষেপ করেন। ইতিহাসের ফলশ্রুতি হিশাবে নয়, ইতিহাসের আরম্ভ হিশাবে ধরে নিয়ে, যেহেতু মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা তাঁদের চিন্তার সঙ্গে মেলে সেই প্রাকৃতিক ব্যক্তি ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত নয় বরং প্রকৃতি প্রস্তাবিত। আজ অবধি প্রতিটি নতুন যুগেই এই বিভ্রম লক্ষণীয়। স্টুয়ার্ট এই সাধারণ বুদ্ধির ভুলটা এড়াতে পেরেছিলেন, কারণ অভিজাত হিশাবে এবং আঠারো শতাব্দীর বিপরীতে তাঁর অবস্থানের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিলো ইতিহাসসম্মত। [২]

ইতিহাসের যতো গভীর অতীতে আমরা যেতে থাকি ততোই ব্যক্তি, অতএব সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তি, আরো নির্ভরশীল—একটি পরিব্যাপ্ত সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত অংশ হিশাবে আবির্ভূত হয়। খুব প্রাকৃতিকভাবেই পরিবারে এবং পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ বিভিন্ন গোত্রে এবং অবশেষে বিভিন্ন গোত্রের সংমিশ্রণ ও বৈপরীত্য থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী সমাজে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি লক্ষ করা যায়। কেবল এই আঠারো শতকে নাগরিক সমাজে সামাজিক সংযুক্তির বিভিন্ন ধরণ ব্যক্তির বাইরে অনিবার্য শর্ত হিশাবে নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থের মাধ্যম রূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু যে যুগ এই দৃষ্টিভঙ্গীর—বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির জন্ম দেয়, সেই যুগই মূলত সবচেয়ে বিকশিত সামাজিক সম্পর্কের (এই দিক থেকে সর্বস্তরের) কাল। মানুষ আক্ষরিক অর্থে একটি রাজনৈতিক প্রাণী, শুধুমাত্র সঙ্গলিপ্সু জন্তুই নয় বরং এমন একটি প্রাণী যে সমাজের অভ্যন্তরেই কেবল নিজের বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত করতে সক্ষম। সমাজের বাইরে একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির উৎপাদন—একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম, অবশ্য তাও ঘটা সম্ভব যদি একজন সভ্য ব্যক্তি, যাঁর ভেতর সামাজিক শক্তি সক্রিয়ভাবে উপস্থিত, তিনি যদি দুর্ঘটনাবশত জনবসতিহীন এলাকায় নির্বাসিত হন। ব্যাপারটা তবু এতো অবিশ্বাস্য যে, অনেকটা একসঙ্গে বসবাস না করেও এবং পরস্পরের মধ্যে কথা-বার্তার চর্চা ছাড়াই মানুষের মধ্যে ভাষার বিকাশ আশা করার মতো।

এইসব একঘেয়ে কথাবার্তা–আঠারোশতকী চরিত্রের জন্য যেসব কথার যুক্তি ও অর্থ হয়ত আছে– সেসব একঘেয়েমিকে বাস্তিআ [৩] কেরি [৪], প্রুধঁ প্রমুখ অর্থশাস্ত্রের অভ্যন্তরে আগ্রহের সঙ্গে যদি না টেনে

আনতেন, তাহলে প্রসঙ্গটিকে স্রেফ বাদই দেয়া যেতো। তবে একথা নিশ্চিত যে, অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের উৎপত্তির একটা ঐতিহাসিক-দার্শনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোই প্রুধঁ প্রমুখের পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ সে সবের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে প্রুধঁ নিজেই অজ্ঞ। এ সবের ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে উপকল্প ফেঁদে, বুঝিবা আদম বা প্রমিথিউস আগে থেকে তৈরি এইসব ধারণাগুলোর ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন, আর তারপর সেসব গৃহীত হয়েছে, প্রভৃতি। একই উৎস থেকে এসবের উৎপত্তি হয়েছে এই ফ্যান্টাসির চেয়ে নিরস আর একঘেঁয়ে কিছুই হতে পারে না।

ঐতিহাসিক উৎপাদন সম্পর্কের শাশ্বতকরণ
সার্বিক বিচারে উৎপাদন ও বিতরণ
সম্পত্তি

অতএব আমরা যখন উৎপাদনের কথা বলি তার অর্থ সবসময়ই সামাজিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের উৎপাদন—সামাজিক ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদন। সুতরাং, এটা স্বাভাবিক যে, উৎপাদন প্রসঙ্গে আমাদের আদৌ যদি কিছু বলতে হয় তাহলে আমাদের হয় বিভিন্ন পর্যায়ে এর ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করতে হবে, অথবা শুরুতেই বলে রাখতে হবে যে, আমরা একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের আলোচনা করছি, যেমন আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন, এখানে আমাদেরও বিশেষ বিষয়টি আসলে এটাই। সে যাই হোক, সব যুগের উৎপাদনেরই কিছু নির্দিষ্ট সাধারণ লক্ষণ বা সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। **উৎপাদনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য** নির্ধারণ একটি বিমূর্ত প্রক্রিয়া, কিন্তু এই বিমূর্তায়ন অর্থপূর্ণ হতে পারে কেবল তখনই যদি সাধারণ লক্ষণগুলোকে স্পষ্ট করে তোলা ও সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে সত্যি সত্যিই এ প্রক্রিয়া সফল হয় এবং পুনরাবৃত্তি এড়াতে আমাদের সাহায্য করে। তাছাড়া এই **সাধারণ বৈশিষ্ট্য** নির্ণয়ের প্রত্যয়সমূহ, অর্থাৎ তুলনামূলক যাচাইয়ের পর ছেঁকে তোলা এইসব সাধারণ উপাদানসমূহের প্রত্যেকটি হচ্ছে আরো বিভিন্ন অনু-উপাদানের জটিল সমন্বয়, যে অনু-উপাদান আরো ভিন্ন প্রত্যয়ের রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সব যুগেই

বিদ্যমান থাকে, অপরাপর অল্প কয়েকটিতে। আবার সবচেয়ে আধুনিক আর সবচেয়ে পুরাতন যুগের মধ্যেও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা দুয়ের মধ্যেই সমানভাবে উপস্থিত, এসব বাদ দিয়ে উৎপাদনের কথা ভাবাই যায় না। সে যাই হোক, সবচেয়ে বিকশিত ভাষা ও সবচেয়ে কম বিকশিত ভাষার মতো দুয়ের মধ্যে সাধারণ নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলেও যেসব উপাদান তাদের বিকাশের নির্ণায়ক—অর্থাৎ যেসব বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন ও সাধারণ নয় সেসবকে অবশ্যই উৎপাদনের সাধারণ আলোচনায় ব্যবহৃত মৌল প্রত্যয়গুলো থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। যেন মৌলিক পার্থক্যগুলো দুয়ের ঐক্যমিলের কারণে ভুলে যাওয়া না হয়, ইতোমধ্যেই আলোচনায় কর্তারূপী মানুষ আর কর্মের বিষয়রূপী প্রকৃতি—এ দুটোকে একত্র করে ফেলা হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ, যারা বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের শাশ্বত অস্তিত্ব ও নির্বিরোধ চরিত্র হরদম ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন তাদের যাবতীয় প্রজ্ঞা এই ভুলে যাওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ : কোনো উৎপাদনই সম্ভব নয় যদি না কোনো উৎপাদনের যন্ত্র থাকে—হোক না সে যন্ত্র শুধু হাত। কোন উৎপাদনই অতীতে নিয়োজিত আর জমিয়ে রাখা শ্রম ছাড়া সম্ভব নয়, তা শুধুমাত্র ক্রমাগত অনুশীলনে আদিম মানুষের বাহুতে সংগৃহীত ও পুঞ্জিভূত দক্ষতাই হোক। পুঁজি আরো অনেক কিছু ছাড়াও উৎপাদনের যন্ত্র নিশ্চয়ই, এমনকি তা বিদ্যমানতাপ্রাপ্ত বিগত শ্রমও বটে। অতএব পুঁজির মানে দাঁড়াচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে এক শাশ্বত ও সর্বজনীন সম্পর্ক যদি আমি সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য—একমাত্র যে বৈশিষ্ট্যের কারণে 'উৎপাদনের যন্ত্র' আর 'জমিয়ে রাখা শ্রম' পুঁজিতে পরিণত হয়, সেই বৈশিষ্ট্যকে আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে রাখি। এভাবে উৎপাদন-সম্পর্কের পুরো ইতিহাসটাই কেরীর কাছে কু-মতলবী সরকারসমূহের জালিয়াতি বলে মনে হয়েছে।

যদি সাধারণ অর্থে উৎপাদন বলে কিছু না থাকে তাহলে উৎপাদনের সাধারণ রূপ বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। উৎপাদন সবসময়ই কোনো একটি বিশেষ শাখার উৎপাদন, যেমন, কৃষি, গবাদিপশু প্রতিপালন, কারখানা, প্রভৃতি—অথবা এ হচ্ছে এই সমস্ত কিছুরই সামগ্রিক রূপ। তবে অর্থশাস্ত্র কৃৎকৌশল নয়। সামাজিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উৎপাদনের বিশিষ্ট রূপের যে সম্পর্ক রয়েছে সে সম্বন্ধে অন্যত্র (পরে)

আলোচনা করা হবে। শেষ কথা হলো, উৎপাদন শুধুমাত্র বিশেষ উৎপাদনই নয়, বরং এ হচ্ছে সবসময়ই এক নির্দিষ্ট সামাজিক অবয়ব, একটি সামাজিক সত্তা, যে সত্তা সবসময়েই ব্যাপ্ত বা সীমিত বিভিন্ন উৎপাদন শাখার সমগ্রতার ভেতর সক্রিয়। বৈজ্ঞানিক উপস্থাপন ও বাস্তবিক গতিপ্রক্রিয়ার সম্পর্ক এখানে বিচার্য নয়। উৎপাদনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিশেষ শাখাসমূহের উৎপাদন। উৎপাদনের সমগ্রতা।

অর্থনীতিক সন্দর্ভ রচনার একটি কেতাদুরস্ত দিক হলো ভূমিকায় একটি সাধারণ আলোচনা সংযুক্ত করা। আর ঠিক এই অংশটিই 'উৎপাদন' শিরোনামে অভিহিত করা হয় (উদাহরণ হিশাবে জন স্টুয়ার্ট মিল [৫] লক্ষণীয়); এখানে সবরকম উৎপাদনের সাধারণ পূর্ব শর্ত সমূহ আলোচিত হয়। এই সাধারণ অংশে যা-যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে দাবি করা হয় সেসব হচ্ছে : (১) সেসব শর্ত—যা না হলে উৎপাদন অসম্ভব। অর্থাৎ কার্যত যে কোনো উৎপাদনের প্রধান মুহূর্তগুলোর উল্লেখ থাকে এখানে। কিন্তু আমরা একটু পরেই দেখবো যে, এখানে খুবই সাধারণ কিছু লক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটিকে সংকীর্ণ করে আনা হয় আর তাদের প্রকাশ করা হয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথার অনুল্লেখযোগ্য ছেঁদো ভাষ্যে।

(২) উৎপাদনকে কমবেশি আগ বাড়িয়ে নেবার শর্ত; যেমন আদম স্মিথের অনড় আর বিকাশমান সমাজ। একথা ঠিক যে, তাঁর রচনায় ব্যাপারটির উল্লেখ দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে কিন্তু একে বিজ্ঞানসম্মত করতে হলে তাঁকে প্রতিটি মানব-গোষ্ঠীর বিকাশের মধ্যে উৎপাদনশীলতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পর্যায়গুলো অনুসন্ধান করতে হবে। এ ধরনের অনুসন্ধান যদিও তাঁর বিষয়সীমার বাইরে, তবুও, যেসব প্রসঙ্গ তাঁর মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেসব প্রসঙ্গকে প্রতিযোগিতা পুঞ্জীভবন, প্রভৃতি ক্রমবর্ধমান বিকাশের আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এসবের একটা রীতিমাফিক সাধারণ উত্তর দাঁড়ায় এরকম যে, শিল্পোন্নত জনগোষ্ঠী উৎপাদনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে সেই মুহূর্তে পৌঁছে যখন তারা মোটামুটি উন্নীত থাকে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আসলে একটি জনগোষ্ঠী মুনাফা করছে কিনা তা দিয়ে তার শিল্প-বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় বিচার করা চলে না, বরং দেখতে হবে মুনাফা করাটাই উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য কিনা। এদিক থেকে ইয়াংকিরা বৃটিশদের চেয়ে উন্নত। অথবা একথাও ঠিক যে, কিছু কিছু জাতি,

এলাকা, আবহাওয়া প্রাকৃতিক অবস্থা —যেমন, সামুদ্রিক বন্দরের সুবিধা, মাটির উর্বরতা প্রভৃতির তুলনায় অপরাপর উদাহরণের চেয়ে উৎপাদনের অধিক উপযোগী, এটাও সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলার মতো হলো যে সম্পদ উৎপাদন সেসব ক্ষেত্রেই সহজে সম্ভব যেখানে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কার্যকরভাবে এবং বৈষয়িকভাবে ভালোরকম উপস্থিত থাকে।

কিন্তু এই সাধারণ অধ্যায়ে এসব কিছুই অর্থনীতিবিদদের আলোচ্য নয়। এখানে তাদের লক্ষ্য থাকে উৎপাদনকে বিতরণ প্রভৃতি থেকে রীতিমতো আলাদা করে উপস্থাপন করা—উদাহরণ হিশাবে মিল দ্রষ্টব্য: সযত্নে উৎপাদনকে এভাবে ইতিহাসের বাইরে শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়ম হিশাবে পেশ করা হয় এবং সুযোগ মতো চুপি চুপি বুর্জোয়া সম্পর্কগুলোকে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম হিশাবে সমাজের বিমূর্ত আলোচনায় চালান করে দেয়া হয়। এ ধরনের আলোচনার এটাই হচ্ছে কমবেশি সচেতন লক্ষ্য। পক্ষান্তরে বিতরণের আলোচনায় মানবসমাজের স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেকটা স্বীকার করে নেয়া হয়। উৎপাদন ও বিতরণ এবং তাদের সম্পর্কের এই স্থূল বিভক্তিকরণ বাদ দিলেও শুরুতেই বোঝা যায় সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিতরণ যতো বিভিন্ন রূপই পরিগ্রহণ করুক না কেন, এখানেও, উৎপাদনের মতোই তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই গুরুত্বারোপ করা হয়; এভাবে মানবজাতির সর্বকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে অভিহিত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যকার ঐতিহাসিক পার্থক্যগুলো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে বা মুছে যায়। যেমন দাস, কৃষক বা শ্রমিক প্রত্যেকে তাদের দাসত্ব, কৃষকত্ব বা শ্রমিকত্ব বজায় রাখার জন্য যা পায় তা একই পরিমাণ খাদ্য। যে বিজয়ী শক্তি বশ্যতার শর্ত হিশাবে প্রদত্ত করের ওপর টিকে থাকে, অথবা যে সরকারী কর্মচারী রাজস্বের ওপর বেঁচে থাকে, অথবা যে ভূস্বামী খাজনার ওপর বেঁচে থাকে, অথবা যে সন্যাসী ভিক্ষার ওপর বেঁচে থাকে—তারা প্রত্যেকে সামাজিক সম্পদের যে শরিকানা লাভ করে সে শরিকানা নির্ণীত হয় দাস প্রভৃতির শরিকানা-প্রাপ্তির নিয়ম থেকে আলাদা সূত্রে। এই অধ্যায়ে যে দুটো প্রধান বিষয়কে অর্থনীতিবিদরা স্থান দেন সেগুলো হচ্ছে- (১) সম্পত্তি এবং (২) কোর্ট পুলিশ প্রভৃতি কর্তৃক সম্পত্তি সংরক্ষণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুটো সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়া যেতে পারে,

১। বা প্রথমটির ক্ষেত্রে : সকল উৎপাদনই একজন ব্যক্তির সমাজের অভ্যন্তরে থেকে ও নির্দিষ্ট সামাজিক পরিগঠনের ভেতর দিয়ে প্রকৃতিকে আত্মস্থ করা। এদিক থেকে বিচার করলে সম্পত্তি (আত্মস্থকরণ) উৎপাদনের শর্ত—একথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলার শামিল। কিন্তু এখান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সম্পত্তির প্রসঙ্গে লাফ দিয়ে যাওয়া হাস্যকর, যেমন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি (যা আবার সঙ্গে সঙ্গে এর বিপরীত রূপ 'সম্পত্তিহীনতার' পূর্বনির্ধারক)। ইতিহাসে বরং দেখা যায় যে, যৌথ সম্পত্তিই (যেমন, ভারতে, স্লাভদের মধ্যে আদি কেলটবাসীদের ক্ষেত্রে, প্রভৃতি) হচ্ছে সম্পত্তির আদি রূপ এবং সম্পত্তি এই যৌথ রূপের ভেতর দিয়েই দীর্ঘকাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পত্তির এই রূপ বা অন্য রূপের মধ্যে কোনটি সম্পদের দ্রুত সমৃদ্ধি আনয়নের উপযোগী তা এখানে বিচার্য নয়। সে যাই হোক, এও আর সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলা যে, যেখানে সম্পত্তি বিশেষ কোনো রূপ পরিগ্রহণ করে নি সেখানে উৎপাদনও অনুপস্থিত। আত্মস্থকরণ অথচ কোনো কিছুকে সম্পত্তিতে পরিণত করে না কথাটা পরস্পরবিরোধী।

(২) বা দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে : সম্পত্তি সংরক্ষণ প্রভৃতি। এসব খুঁটিনাটির আসল মর্ম উদঘাটিত হলে দেখা যাবে প্রবক্তারা যা জানে কথাগুলো তার চেয়ে বেশি ব্যক্ত করে। যেমন, উৎপাদনের প্রতিটি রূপ এর নিজস্ব আইন, সরকারের রূপ, প্রভৃতির সৃষ্টি করে। যাবতীয় যেসব প্রসঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পৃক্ত তাদের যদি আকস্মিকভাবে, শুধুমাত্র চিন্তা করতে গিয়েই সংযুক্ত করে দেখা হয়, তারা তখন হয়ে পড়ে অপরিচ্ছন্ন আর বোধগম্যতার অতীত। আধুনিক অর্থনীতিদিরা জানেন যে, 'জোর যার মুল্লুক তার' প্রভৃতি জবরদস্তি সামাজিক অবস্থার চেয়েও আধুনিক পুলিশের নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ভালোভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। তাঁরা ভুলে যান যে, এই জবরদস্তিটাও একটি আইনি সম্পর্ক এবং তাদের 'সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রে' এই জোর যার মুল্লুক তার নীতিটিই চালু হয়েছে—তবে কেবল অন্য ঢং-এ।

উৎপাদনের একটি পর্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সামাজিক অবস্থার যখন শুধুমাত্র উন্মেষ ঘটেছে অথবা তখন ইতোমধ্যেই যে ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছে, তখন, স্বাভাবিক কারণেই, পরিণতি ও প্রকোপ ভেদে উৎপাদনও ব্যাহত হয়।

সারমর্ম : উৎপাদনের সকল পর্যায়ে পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয় কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমাদের মন যাকে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিশাবে চিহ্নিত

করে। কিন্তু তথাকথিত সকল উৎপাদনের সাধারণ পূর্বশর্ত কথাটা মনের সংজ্ঞায়ন প্রক্রিয়ার বিমূর্ত মুহূর্ত ছাড়া কিছুই নয় যা দিয়ে উৎপাদনের সত্যিকার ঐতিহাসিক পর্যায় অনুধাবন করা অসম্ভব।

২. বিতরণ, বিনিময় ও ভোগের সঙ্গে উৎপাদনের সাধারণ সম্পর্ক

উৎপাদনের বিশ্লেষণ আরো গভীরে নেবার আগে প্রথমে দরকার বিশ্লেষণের পাশাপাশি অর্থনীতিবিদরা যেসব প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা খাড়া করেন সেসবের ওপর আলোকপাত।

সুস্পষ্ট আর গতানুগতিক একটি ধারণা হচ্ছে– মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজের সদস্যরা উৎপাদনে প্রাকৃতিক বস্তুকে আত্মস্থ করে (অর্থাৎ তৈরি করে, রূপ প্রদান করে) উৎপন্ন দ্রব্যে ব্যক্তিরা শরিকানা নির্ণয় করে বিতরণ, বিতরণ ব্যক্তিকে আগে যে অংশ প্রদান করে সে অংশ বদলাবার ইচ্ছে থাকলে আকাঙ্ক্ষিত বিশেষ দ্রব্য লাভের মাধ্যম হচ্ছে বিনিময়; অবশেষে ভোগের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যক্তির বাসনা চরিতার্থ করার আর আত্মস্থ করার উপকরণে পরিণত হয়। প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন দ্রব্যাদি তৈরি করে সামাজিক কানুনমাফিক বিতরণ তা বণ্টন করে দেয়, বিনিময় এই বিতরিত বণ্টনকেও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আবার বিলি করে, এবং অবশেষে ভোগের পর্যায়ে হাজির হয়ে উৎপন্ন দ্রব্য এই সামাজিক গতিপ্রক্রিয়ার বাইরে ব্যক্তির সরাসরি ব্যবহারের সেবাদাস হিশাবে উপভোগের উপকরণে পরিণত হয়। তাহলে, উৎপাদন আসছে প্রক্রিয়ার আরম্ভ হিশাবে আর ভোগের পর্যায়টা হলো উপসংহার, বিতরণ ও বিনিময় হচ্ছে মধ্যবর্তী পর্যায়, যার আবার দুটো দিক রয়েছে—কারণ, একদিকে বিতরণের নির্ণায়ক হচ্ছে সমাজ, অন্যদিকে ব্যক্তি নির্ধারণ করছে বিনিময়। উৎপাদনের ভেতর দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে মূর্ত করে তোলে; আর উৎপন্ন বস্তু ব্যক্তির ভেতর নিজের কার্যকারিতা লাভ করে। বিতরণ সাধারণ আর প্রধান নির্ধারকের রূপ নিয়ে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যস্থ ভূমিকা পালন করে ; বিনিময়ে দুয়ের মধ্যস্থতা রক্ষা করে ব্যক্তির আকস্মিক ইচ্ছা অনিচ্ছার বৈশিষ্ট্য।

উৎপন্নের যে পরিমাণ অংশ ব্যক্তির ভাগে পড়ে সে অংশ নির্ধারণের সম্পর্ক নির্ণয় করে বিতরণ। বিনিময় উৎপাদনের নির্ণায়ক যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বিতরণ অনুযায়ী নির্ধারিত নিজের বরাদ্দ দাবি করে নেয়।

দেখা যাচ্ছে উৎপাদন, বিতরণ, বিনিময় ও ভোগ নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তের রূপ (Syilogism) পরিগ্রহণ করেছে, উৎপাদন হচ্ছে সাধারণ রূপ, বিতরণ ও বিনিময় বিশেষ রূপ আর ভোগ হচ্ছে অভিব্যক্ত রূপ যার মধ্যে পূর্বাপর প্রক্রিয়া একত্রে গ্রথিত। এই সমন্বিত গ্রন্থনা স্বীকার না করে উপায় নেই, কিন্তু সমন্বয়টা গভীর নয়। উৎপাদন সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অধীন, বিতরণ সামাজিক আকস্মিকতার এ কারণে বিতরণ কমবেশি উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাতে পারে; দুয়ের মাঝখানে বিনিময় সামাজিক চলাচলের লৌকিকতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভোগ—যা সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি, একে ধরা হয়েছে শুধু মাত্র শেষবিন্দু হিশাবেই নয় বরং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজের পরিসমাপ্তি হিশাবে। মূলত ভোগের অবস্থান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বাইরে। ব্যতিক্রম ঘটে তখন যখন প্রক্রিয়ার আরম্ভকে ভোগ পাল্টা প্রভাবিত করে আর নতুন আরম্ভের উদ্যোগ সঞ্চার করে।

অর্থশাস্ত্রের বাইরে বা ভেতরে যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, বিরোধীদের নালিশ হচ্ছে যা কিছু একত্রে থাকার কথা সেসবকে বর্বরভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে; নালিশবাজরা কিন্তু অর্থশাস্ত্রবিদদের অবস্থানেই কিম্বা তারো পাদদেশে দণ্ডায়মান। উৎপাদন নিজেই নিজের ভেতর সমাপ্ত এ দিকটাতেই অর্থশাস্ত্রবিদরা বাড়াবাড়ি রকম দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন অথচ বিতরণ মোটেও কম গুরত্বপূর্ণ নয়—এ অভিযোগটির চেয়ে বহুল প্রচলিত নালিশ আর নেই। এই নালিশের ভিত্তি সেই অর্থনীতিক ধ্যানধারণা যাতে উৎপাদন ও বিতরণ দুটো আলাদা আলাদা আর পাশাপাশি লাগোয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা হিশাবেই বিবেচ্য; কিম্বা এই দুই মুহূর্তকে তাদের সামগ্রিকতার ভেতর এক করে দেখা হয় নি। ভাবখানা এমন—যেন এই বিখণ্ডন সত্যিকারের বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে পাঠ্যগ্রন্থে ঢুকে পড়ে নি বরং পাঠগ্রন্থ থেকে বাস্তব জগতে ঢুকে পড়েছে। এবং যেনবা বর্তমান দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যয়গুলোর দ্বান্দ্বিক সমীকরণ- সত্যিকারের বাস্তব সম্পর্কের উপলব্ধি নয়।

[ভোগ ও উৎপাদন]

উৎপাদন একই সঙ্গে আবার ভোগও বটে—দু'প্রকারের ভোগ ব্যক্তিগত (Subjetive) ও বৈষয়িক (Objective) । ব্যক্তি তার সামর্থ্যকে

উৎপাদনে শুধু বিকশিতই করে না, ব্যয়ও করে, উৎপাদনের কাজে তা নিঃশেষিত হয়, ঠিক প্রাকৃতিক প্রজনন যে অর্থে জীবনী-শক্তির ভোগ; দ্বিতীয়ত উৎপাদনের উপকরণসমূহের ভোগব্যবহার, যা ক্রমব্যবহারে জীর্ণ হতে থাকে এবং আংশিকভাবে (যেমন দহনক্রিয়ায়) বিগঠিত হয়ে তাদের মৌল-উপাদানে পুনরায় রূপান্তর লাভ করে। কাঁচামাল ভোগব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। ব্যবহার হতে গিয়ে নিজের প্রাকৃতিক গঠন আর আকার কাঁচামাল হারিয়ে ফেলে।

সুতরাং উৎপাদন কর্মকাণ্ডের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আবার ভোগেরই প্রক্রিয়া। অর্থশাস্ত্রবিদরা একথা স্বীকার করেন। উৎপাদন যখন সরাসরি ভোগ থেকে অভিন্ন আর ভোগ যখন সরাসরি উৎপাদনের সহযোজক তখন তাঁরা একে বলেন উৎপাদনমূলক ভোগ (Productive Consumption) । উৎপাদন ও ভোগের এই অভিন্ন সমীকরণ স্পিনোজার সেই সূত্রের মতো যাকে তিনি বলতেন Determinatio est negatio [৬]।

কিন্তু এই উৎপাদনমূলক ভোগের সংজ্ঞাকে সামনে খাড়া করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যিকারের ভোগকে উৎপাদনের সমার্থক ভোগ থেকে আলাদা করা, উৎপাদনের ধ্বংসাত্মক বিপরীত দিক হিশাবে যাকে গণ্য করা হয়। সুতরাং, সত্যিকারের ভোগকে এখন বিশ্লেষণ করা যাক।

ভোগও আবার সাক্ষাৎ উৎপাদন। ঠিক যেমন উদ্ভিদের উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রকৃতির মৌলিক শক্তি ও রাসায়নিক উপাদানসমূহের ভোগ। এটা স্পষ্ট যে, আহারাদি, যা ভোগেরই একটি রূপ—তার ভেতর দিয়ে মানুষ নিজের শরীরকেই উৎপাদন করে। অবশ্য সেটা প্রত্যেক ধরনের ভোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ তা কোনো-না-কোনো ভাবে মানুষকে কোনো একটি দিক থেকে উৎপাদন করে। অর্থাৎ তা ভোগমূলক উপাদান। কিন্তু, অর্থনীতি বলে, উৎপাদনের এই দিকটা ভোগের যা সমতুল্য, তা নাকি গৌণ ব্যাপার, প্রাথমিক বস্তুর বিনাশ থেকে তার উৎপত্তি। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদক নিজেকে অভিব্যক্ত করে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার তৈরি উৎপন্ন বস্তু নিজেকে ব্যক্তিময় করে তোলে। অতএব এই ভোগমূলক উৎপাদন—যদিও তা উৎপাদন ও ভোগের অব্যবহিত ঐক্যের সূচক—তবুও তা সত্যিকারের উৎপাদন থেকে আলাদা। উৎপাদন যেখানে ভোগের আর ভোগ যেখানে উৎপাদনের সহযোজক, সেই অব্যবহিত ঐক্যের মধ্যেও তারা তাদের প্রত্যক্ষ দ্বৈততা বজায় রাখে।

উৎপাদনও তাহলে আবার সাক্ষাৎ ভোগ। ভোগও একই সঙ্গে উৎপাদন। তারা নিজেরা নিজেরই ঠিক সাক্ষাৎ বিপরীত। কিন্তু সেই সঙ্গে দুয়ের মধ্যে একে অপরকে প্রযোজিত করার সক্রিয়তাও বিদ্যমান। উৎপাদন ভোগের প্রযোজক, ভোগের উপকরণাদির সরবরাহকারী, উৎপাদন অনুপস্থিত থাকলে ভোগের বিষয়ও অনুপস্থিত থাকবে। কিন্তু ভোগও আবার উৎপাদনের প্রযোজক। কারণ ভোগই কেবল উৎপন্ন বস্তুর জন্য ভোক্তা সৃষ্টি করে। উৎপন্ন বস্তু তার অন্তিম পূর্ণতা লাভ করে ভোগে। যে রেলপথের ওপর দিয়ে কোনো ট্রেন যাতায়াত করছে না অর্থাৎ যার ব্যবহার নেই, সে রেলপথ শুধু 'সম্ভাব্য' রেলপথ, সত্যিকারের রেলপথ নয়। উৎপাদনকে বাদ দিয়ে ভোগ নেই। কিন্তু আবার ভোগ ছাড়া উৎপাদনও নেই; কারণ সেক্ষেত্রে উৎপাদন হয়ে পড়বে উদ্দেশ্যহীন। ভোগ উৎপাদনকে জন্ম দান করে দু'ভাবে :

(১) যেহেতু, একটি বস্তুর ভোগ সম্পন্ন হলেই কেবল বস্তুটি সত্যিকারের বস্তু হয়ে ওঠে। যেমন পরিধানের ভেতর দিয়েই কেবল একটি পোশাক সত্যিকারের পোশাক হয়ে ওঠে। যে বাড়ীতে কেউ বসবাস করে না সে বাড়ী আসলে সত্যিকারের কোনো বাড়ীই নয়। অতএব স্রেফ প্রাকৃতিক বিষয়ের মতো না হয়ে বস্তু নিজেকে নিজে প্রতিপন্ন করে, হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র ভোগের ভেতর দিয়ে বস্তুময়তা অর্জিত হয়। বস্তুর নিরাকরণ সাধন করেই কেবল ভোগ বস্তুকে অন্তিমপূর্ণতা প্রদান করে, কারণ বস্তু উৎপাদিত বস্তু হয়ে ওঠে কর্মের অভিব্যক্তি হিশাবে নয়, বরং কর্মপরায়ণ কর্তার উপলক্ষ (Object) হিশাবে।

(২) কারণ ভোগ নয়া উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা (Need) সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ভোগ উৎপাদনের আদর্শ, উৎপাদনের জন্য ভেতর থেকে উজ্জীবিত বাধ্যতামূলক কারণ সৃষ্টি করে, যা তার নিজেরও পূর্ব-শর্ত। ভোগ উৎপাদন-প্রেরণার স্রষ্টা যে উদ্দেশ্য উৎপাদনের ভেতর সক্রিয়, ভোগ নিজের লক্ষ্য হিশাবে সেই উদ্দেশ্যেটিকেও সৃষ্টি করে। এটা যদি স্পষ্ট হয় যে, উৎপাদন ভোগকে ভোগের বাহ্যিক উপলক্ষ প্রদান করছে তাহলে এটাও সমভাবে স্বচ্ছ যে, ভোগও উৎপাদনের উপলক্ষকে নিজের অন্তর্গত প্রকল্প, আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা, উদ্দেশ্য হিশাবে প্রাত্যয়িকভাবে উপস্থাপন করে। উৎপাদনের উপলক্ষকে ভোগ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা হিশাবে রূপ দান করে। আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কোনো উৎপাদন নেই, কিন্তু ভোগ সেই আকাঙ্ক্ষাকেই পুনরুৎপাদিত করে।

উৎপাদনের দিক থেকে পাল্টা যা আসছে তা হলো :

(১) উৎপাদন ভোগকে ভোগযোগ্য-বস্তু ও উপকরণ প্রদান করে। ভোগযোগ্য-বস্তু না থাকলে ভোগ কোনো ভোগই নয়, সুতরাং এদিক থেকে উৎপাদন ভোগের স্রষ্টা, ভোগের উৎপাদক।

(২) কিন্তু উৎপাদন শুধু ভোগযোগ্য বস্তুই সৃষ্টি করে না উৎপাদন ভোগকে এর নির্দিষ্টতা, চরিত্র, ও অন্তিম পূর্ণতা প্রদান করে। ভোগ যেভাবে উৎপন্ন বস্তুর উপসংহার টেনে বস্তুকে চরিতার্থ করে, ঠিক তেমনি উৎপাদনও ভোগের সমাপ্তি টেনে একে চরিতার্থ করে তোলে। প্রথমত ভোগযোগ্য-বস্তু সর্বজনীন বস্তু নয়, বরং তা বিশিষ্টতাযুক্ত। ভোগকে অবশ্যই সম্পাদিত হতে হয় নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী—যে পদ্ধতি উৎপাদন কর্তৃক নির্ধারিত। ক্ষুধা মানে ক্ষুধা, কিন্তু যে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটে ছুরি ও কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়া রান্না-করা মাংসে, সে ক্ষুধার সঙ্গে হাত, নখ ও দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কাঁচামাংস খেয়ে নিবৃত্ত ক্ষুধার পার্থক্য আছে। উৎপাদন অতএব ভোগযোগ্য-বস্তুই সৃষ্টি করে না ভোগের পদ্ধতিও সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক পর্যায়ে নয়, ব্যক্তিক পর্যায়েও বটে। উৎপাদন অতএব ভোক্তাও সৃষ্টি করে।

(৩) উৎপাদন আকাঙ্ক্ষা মেটানোর উপকরণই শুধু জোগান দেয় না বরং সে উপকরণের জন্য আকাঙ্ক্ষার জোগানদারও হচ্ছে উৎপাদন। ভোগ যখন এর আদিম অবস্থার অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক পর্যায় (Immediacy) অতিক্রম করে আসে, ভোগ তখন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা হিশাবে নিজেকেই নিজে প্রযোজিত করে। ভোগ যদি আদিম পর্যায় অতিক্রম না করে থাকে, তার অর্থ উৎপাদন আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে। ভোগ বস্তুর জন্য যে আকাঙ্ক্ষা বোধ করে তা বস্তুর ইন্দ্রিয়োপলব্ধি থেকে জাত। শিল্পকলা শিল্পের সমঝদার লোকজন তৈরি করে, যারা সে সৌন্দর্য উপভোগে সক্ষম। অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য। উৎপাদন অতএব ব্যক্তির জন্য বস্তুই শুধু সৃষ্টি করে না বস্তুর জন্য ব্যক্তিকেও সৃষ্টি করে। অতএব উৎপাদন ভোগের স্রষ্টা— (১) ভোগের নিমিত্ত উপকরণ তৈরির ভেতর দিয়ে, (২) ভোগের পদ্ধতি নির্ধারিত করে, (৩) প্রথম থেকেই উৎপাদনের লক্ষ্য হিশাবে প্রকল্পিত বস্তুর উৎপাদন সম্পন্ন করে—সে লক্ষ্য সম্পর্কে উপলব্ধি প্রথমে আসে বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থেকে। উৎপাদন অতএব ভোগযোগ্য-বস্তু, ভোগের পদ্ধতি ও ভোগের প্রবৃত্তির উৎপাদক। ভোগও তেমনি উৎপাদনের, উদ্দেশ্য-

নির্ণায়ক আকাঙ্ক্ষা দিয়ে উৎপাদকের **প্রবণতা** তৈরি করে। ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে যে সাযুজ্য তার তিনটে দিক লক্ষণীয়।

(১) **সাক্ষাৎ সাযুজ্য** : উৎপাদনই ভোগ আর ভোগই উৎপাদন। ভোগমূলক উৎপাদন আর উৎপাদনমূলক ভোগ অর্থবিদরা দুটোকেই উৎপাদনমূলক ভোগ হিশাবে আখ্যায়িত করেন। তবে দু'য়ের মধ্যে তারা এক পার্থক্য বজায় রাখেন। ভোগমূলক উৎপাদন তাঁদের রচনায় পুনরুৎপাদন হিশাবে পরিচিত আর দ্বিতীয়টি চিহ্নিত উৎপাদনমূলক ভোগ হিশাবে। প্রথমটির ক্ষেত্রে তাদের সমস্ত বিচার বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে উৎপাদনমূলক আর অনুৎপাদনমূলক শ্রম। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উৎপাদন-মূলক অনুৎপাদনমূলক ভোগ।

(২) একটি অন্যটির মাধ্যম হিশাবে আবির্ভূত, যেনবা একটি অন্যটিকে প্রযোজিত করছে। একে বলা হয় দু'য়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কায়িত হয়ে থাকে যে, মনে হয় একটিকে ছাড়া অন্যটির কোনো গতি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে তারা বাহ্যিকভাবেই সংযুক্ত। উৎপাদন ভোগের নিমিত্ত যে উপকরণ তৈরি করে সে বস্তু ভোগের বাইরে উপস্থিত থাকে। ভোগ আকাঙ্ক্ষার অর্থাৎ অন্তর্নিহিত উপলক্ষের, উৎপাদনের উদ্দেশ্যের উপস্থাপক। উৎপাদনহীন কোনো ভোগ নেই, এবং ভোগ ছাড়া কোনো উৎপাদন নেই, এই সিদ্ধান্তটি বিভিন্ন রূপ অর্থশাস্ত্রর ভেতর অভিব্যক্তি লাভ করে আসছে।

(৩) উৎপাদন যে সাক্ষাৎ ভোগ আর ভোগও সাক্ষাৎ উৎপাদন শুধুমাত্র তাই নয়, এমনকি উৎপাদন ভোগেরই মাধ্যম শুধু নয়, আর ভোগও কেবল উৎপাদনের লক্ষ্য নয়—যে অর্থে একে অপরকে বিষয় প্রদান করে, (উৎপাদন ভোগের জন্য প্রত্যক্ষ বস্তু আর ভোগ উৎপাদনের প্রাত্যয়িক উদ্দেশ্য)—অন্য কথায় একটি সাক্ষাৎ অন্যটিই শুধু নয় কিংবা পরস্পর পরস্পরের কারণ হিশাবেই শুধু বিরাজ করছে না বরং নিজ ভূমিকা সম্পাদনের ভেতর দিয়ে একে অন্যকে উৎপাদন করছে—নিজেকেই অন্যজন করে তুলছে।

শুধুমাত্র ভোগই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করে, কারণ ভোগই বস্তুর স্বাধীন ও প্রত্যক্ষ আকারের নিরাকরণ সাধন করে বস্তুকে বস্তুত্ব প্রদান করে। তাছাড়া ভোগের পুনরাবৃত্তি উৎপাদনের আদি প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট কর্মক্ষমতাকে ক্রমশ নিপুণ করে তোলে ও অবশেষে দক্ষতায় উন্নীত করে। ভোগ তাহলে পুরো প্রক্রিয়ার উপসংহারই শুধু নয় যা

বস্তুর বস্তুত্ব নিষ্পন্ন করছে—বরং তা উৎপাদককে উৎপাদক করে তোলার কাজও সম্পন্ন করেছে। উৎপাদন, অন্যদিকে, ভোগের নির্দিষ্ট রীতি প্রবর্তনার ভেতর দিয়ে ভোগকে অস্তিত্ব প্রদান করে এবং আকাঙ্ক্ষা হিশাবে ভোগে উদ্দীপনা জাগিয়ে ভোগের ক্ষমতাও সৃষ্টি করে। এই শেষ ধরনের সাযুজ্য, তিন নম্বরে যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে—অর্থশাস্ত্রবিদরা তাকে চাহিদা ও সরবরাহ, বস্তু ও আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন—প্রভৃতির মধ্যকার সম্পর্ক বিচারের সময় নানাভাবে ব্যাখ্যা করে আসছেন।

এরপর একজন হেগেলপন্থীর পক্ষে উৎপাদন আর ভোগকে এক করে দেখার চেয়ে সহজ আর কিছুই হতে পারে না। এবং একাজ–কথা রসিক সমাজতন্ত্রীরাই শুধু নন নিরস অর্থশাস্ত্রদিরাও করে আসছেন। উদাহরণ হিশাবে সে-র [৭] নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ঘোষণা করেছেন, একটি জাতি বা মনুষ্যকুলকে বিমূর্তভাবে ধরলে উৎপাদনই হচ্ছে গিয়ে তার ভোগ। স্টর্শ [৮] দেখিয়েছেন, সে-র এই সিদ্ধান্ত ভুল। বিশেষত এই উদাহরণটি যে, যদি জাতির কথাই ধরা যায়, তাহলে একটি জাতি তার উৎপন্ন সমস্ত কিছুই ভোগ করে ফেলে সেখান থেকে উৎপাদনের উপকরণ, অস্থাবর পুঁজি, প্রভৃতির যোগ রাখতে হয়। তাছাড়া সমাজকে একজন ব্যক্তি হিশাবে দেখা মানে উৎকল্পনার চোখ দিয়ে দেখা, এ দেখা ভুল। ব্যক্তির ক্ষেত্রে উৎপাদন ও ভোগ একই বিষয়ের দুটো ভিন্ন ভিন্ন দিক হিশাবে আবির্ভূত হয়।

যে কথাটি এখানে জোর দেয়া দরকার তা হলো উৎপাদন ও ভোগ একজন বা কয়েকজন ভিন্ন ব্যক্তির সক্রিয়তা, দু'য়ের যেকোনোভাবেই গণ্য করা হোকনা কেন, তা সবসময়ই একই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত দুটো মুহূর্ত হিশাবে প্রকাশিত, এ প্রক্রিয়ার শুরু উৎপাদনে, অতএব উৎপাদনই প্রক্রিয়ার প্রধান মুহূর্ত হিশাবে বিবেচ্য। প্রবৃত্তি হিশাবে—আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হিশাবে ভোগ উৎপাদন কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত মুহূর্ত হিশাবে গণ্য। কিন্তু পুরো প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন শুরু হয় ভোগে, অতএব বাস্তবায়নের প্রধান মুহূর্ত হচ্ছে ভোগ। অর্থাৎ ভোগ হচ্ছে সেই উদ্যোগ যার ভেতর দিয়ে আগাগোড়া প্রক্রিয়াটাই পুনরায় সচল হয়ে ওঠে। বস্তুর উৎপাদক হচ্ছে ব্যক্তি, বস্তুকে ভোগ করার ভেতর দিয়ে ব্যক্তি নিজের কাছে ফিরে আসে। কিন্তু সে ফেরা হচ্ছে একজন উৎপাদনশীল ব্যক্তির আর নিজেই নিজের পুনরুৎপাদনে সক্ষম

সম্পাদকের। ভোগ এভাবে উৎপাদনের একটি মুহূর্ত হিশাবে প্রকাশ লাভ করে।

সে যাইহোক, বস্তুর উৎপাদন সম্পন্ন হবার পর উৎপাদকের সঙ্গে উৎপন্ন বস্তুর সম্পর্ক থাকে বাহ্যিক, এবং বস্তুতে ব্যক্তির প্রত্যাবর্তন নির্ভর করে সমাজের অন্যান্যের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ওপর। বস্তু সরাসরি ব্যক্তির অধিকারে আসে না, সে যা উৎপাদন করে উৎপাদনের পরপরেই তা আত্মস্থ করা তার উদ্দেশ্য নয়। সামাজিক-নিয়ম কানুন অনুযায়ী উৎপন্ন বস্তুর জগতে উৎপাদকের শরিকানা কী হবে তা নির্ণয় করার জন্য বিতরণ উৎপাদক ও উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে, অতএব উৎপাদন ও ভোগের মাঝখানে প্রবেশ করে।

এখন, বিতরণ কি উৎপাদনের পাশে বা বাইরে স্বাধীন এলাকা হিশাবে বিরাজমান?

বিতরণ ও উৎপাদন

কেউ যখন অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত গ্রন্থগুলো পরীক্ষা করেন তখন তার চোখে সঙ্গে সঙ্গে ধারা পড়ে যে, এর ভেতর সব কিছুই দু'বার করে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, জমির খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা একবার উল্লেখিত হয় বিতরণের বেলায়, আবার উৎপাদনের উদ্যোক্তা হিশাবে জমি, শ্রম ও পুঁজি উৎপাদনের নীচেও উল্লিখিত থাকে। এখন, পুঁজির কথাই ধরা যাক, শুরুতেই যা স্পষ্ট তা হলো একে দু'বার ধরা হয়, (১) উৎপাদনের উদ্যোক্তা হিশাবে (২) আয়ের উৎস অর্থাৎ বিতরণের একটি বিশেষ রূপের নির্ণায়ক হিশাবে। সুদ এবং মুনাফাও ঠিক একইভাবে উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত—অন্তত যতোটুকু তারা সেই রূপ যার মধ্যে পুঁজি পরিমাণে বাড়তে থাকে আর ফেঁপে ওঠে। অতএব তারা পুঁজির উৎপাদনেরই একটি পর্যায়। বিতরণের রূপ হিশাবে সুদ ও পুঁজি উৎপাদনেরই উদ্যোক্তা পুঁজিকে নিজেদের পূর্বশর্ত হিশাবে গণ্য করে। অর্থাৎ তারা বিতরণেরই রূপ যার পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদনের উদ্যোক্তা পুঁজি। তারা একই কারণে পুঁজির পুনরুৎপাদনেরও একটি পদ্ধতি।

একইভাবে, মজুরি নামক প্রত্যায়িত সংজ্ঞা মজুরি শ্রম শিরোনামে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়, উৎপাদনের উদ্যোক্তা হিশাবে শ্রম যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এখানে তার অভিব্যক্তি ঘটে বিতরণের বৈশিষ্ট্য

নিয়ে। শ্রম যদি মজুরি-শ্রমের নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ না করতো উৎপন্ন বস্তুতে শ্রমের শরিকানা মজুরি হিশাবে আবির্ভূত হতো না—যেমন দাসব্যবস্থায়। অবশেষে খাজনার কথা—ধরা যাক বিতরণের সবচেয়ে বিকশিত পর্যায়ের কথাই, যার মধ্য দিয়ে ভূসম্পত্তি উৎপন্ন দ্রব্যের শরিকানা লাভ করে, সে ক্ষেত্রে খাজনা আবির্ভাবের পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ হিশাবে পরিগণিত বৃহৎ ভূস্পত্তি (সঠিক অর্থে বৃহদায়তন কৃষি), স্রেফ জমি নয়। ঠিক যেমন মজুরির পূর্বশর্ত হিশাবে স্রেফ শ্রমকেই বোঝায় না। সমুদয় সম্পর্ক ও বিতরণের পদ্ধতি এভাবে উৎপাদন উপকরণের বিপরীত দিক হিশাবে প্রকাশ লাভ করে। উৎপাদনের মজুরি শ্রমিক হিশাবে অংশগ্রহণকারী একজন ব্যক্তি উৎপাদনের ফলাফলে—উৎপাদিত বস্তুতে শরিকানা লাভ করে মজুরির মাধ্যমে। বিতরণের কাঠামো সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনের কাঠামো দিয়ে নির্ণীত হয়। বিতরণ নিজে উৎপাদনের ফলশ্রুতি, শুধুমাত্র মর্মবস্তুর দিক থেকেই নয়, কারণ উৎপাদনের ফলই তো বিতরিত হয়, বরং রূপের দিক থেকেও—উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের সংযুক্তির রূপ দিয়ে বিতরণের রূপ নির্ণীত হয়, যে রূপ উৎপন্ন বস্তুতে তাদের শরিকানা নির্ধারণ করে। উৎপাদনের অধ্যায়ে ভূমি আর বিতরণের অধ্যায়ে খাজনার প্রসঙ্গে উপস্থাপন আগাগোড়া একটা বিভ্রান্তিই বটে।

এভাবে রিকার্ডোর মতো অর্থশাস্ত্রবিদরা, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা শুধুমাত্র উৎপাদনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি, তারাও বিতরণকেই অর্থশাস্ত্রের একমাত্র বিষয় বলে গণ্য করেছেন। কারণ, সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণায় তারা বুঝতে পেরেছিলেন, বিতরণের রূপই হচ্ছে সেই বিশেষ অভিব্যক্তি যার ভেতর একটি সমাজের উৎপাদনের সমুদয় চালিকাশক্তি আকার লাভ করে।

তবে এটাতো বটেই যে, একজন ব্যক্তির দিক থেকে দেখলে বিতরণ উৎপাদন পদ্ধতির ভেতর নিজের অবস্থান নির্ণায়ক সামাজিক কানুন হিশাবে আবির্ভূত হয়, যে উৎপাদন পদ্ধতির ভেতর অন্তর্গত হয় সে নিজেও উৎপাদনে নিয়োজিত, অতএব যার আগমন উৎপাদনের আগে পৃথিবীতে সে মানুষ জমি বা পুঁজি কোনোটি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিক বিতরণ জন্ম থেকেই তাকে মজুরি শ্রমিক বানিয়ে দেয়। কিন্তু বানিয়ে দেবার এই পরিস্থিতি উৎপাদনের এজেন্ট রূপে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান পুঁজি ও ভূসম্পত্তির উপস্থিতিরই ফল।

এছাড়াও সমস্ত সমাজের কথা ধরলে অন্য এক দিক থেকেও বিতরণ উৎপাদনের আগে আবির্ভূত বলে বিবেচ্য। বিজয়ী জাতি জয়ীদের মধ্যে জমি বণ্টন করে নেয়, এবং তা করতে গিয়ে তারা বিতরণের বিশেষ এক রূপ আর সম্পত্তির ধরণ আরোপ করে অতএব এতে উৎপাদনের ধরনও নির্ণীত হয়ে যায়। অথবা, বিজয়ীরা বিজিতদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দাসত্বে, আর তার ফলে উৎপাদনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় দাস শ্রমের ওপর। অথবা, জনগণ বৈপ্লবিক উত্থান ঘটিয়ে বিশাল ভূসম্পত্তিগুলো ছোট ছোট ভূখণ্ডে ভাগ করে নেয়, ফলে নতুন বিতরণ সম্পন্ন হবার কারণে উৎপাদনের চরিত্রও নতুনত্ব লাভ করে। অথবা আইনের কোনো এক পদ্ধতি জমির মালিকানা চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পরিবারকে প্রদান করে রাখে। কিম্বা শ্রমকে বংশের উত্তরাধিকার হিশাবে বিতরণ করে রাখা হয়, যাতে নির্দিষ্ট বর্ণের কোনো একটি জাতের (Caste) মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে। উল্লিখিত ঐতিহাসিক উদাহরণের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে ধারণা জন্মে যে, বিতরণের কাঠামো উৎপাদন স্থির করছে না বা তাকে নির্ণয়ও করছে না বরং উল্টোটি ঘটছে—বিতরণ করছে উৎপাদনকে।

খুব স্থূল বুদ্ধিতে বিতরণ উৎপন্ন বস্তুর বিতরণ বলেই পরিগণিত; সুতরাং উৎপাদন-ছুট আপাতস্বাধীন বিতরণের যে ধারণা চালু রয়েছে তা থেকেও এ ধারণা অনেক দূরের ব্যাপার। কিন্তু বিতরণকে উৎপন্ন বস্তু বিতরণেরও আগে হতে হচ্ছে (১) উৎপাদনযন্ত্রের বিতরণ এবং (২) এই সম্পর্কেরই আরো নির্দিষ্টকৃত অর্থে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন কর্মে সমাজের সদস্য বর্গের বিতরণ। (এ হচ্ছে নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের আওতায় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি)। এটা খুবই স্পষ্ট যে, উৎপন্ন বস্তু-বিতরণ এই বিতরণেরই পরিণতি যা উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত এবং সে কারণে তা উৎপাদনেরও নির্ণায়ক। উৎপাদনের অন্তর্গত এই অভ্যন্তরীণ বিতরণকে উপেক্ষা করে উৎপাদনের বিচার স্পষ্টতই ভুয়ো বিমূর্তায়ন, যখন অপরদিকে, উৎপন্ন বস্তুর বিতরণ এই বিতরণ থেকেই উদ্ভূত হয়ে উৎপাদনের একটি মৌলিক মুহূর্ত হিশাবে রূপ লাভ করছে। সেকারণেই রিকার্ডো, আধুনিক উৎপাদনের সামাজিক বিন্যাস বুঝে ওঠার জন্য যিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন, এবং আপন বৈশিষ্ট্যের গুণে যাঁর খ্যাতি উৎপাদন-শাস্ত্রবিদ হিশাবে; ঘোষণা করেন যে, উৎপাদন নয়—বিতরণই আধুনিক অর্থশাস্ত্রের আসল আলোচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে আবার সেইসব

অর্থশাস্ত্রবিদদের ব্যর্থতা গোচরীভূত হচ্ছে ইতিহাসকে বিতরণের এলাকায় চালান করে দিয়ে উৎপাদনকে যারা শাশ্বত সত্য হিশাবে অধিষ্ঠিত করেন।

উৎপাদন সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই উৎপাদন-নির্ণায়ক বিতরণ আর উৎপাদন সম্পর্কের প্রশ্নটি স্পষ্টত জড়িত। যদি বলা হয় যে, যেহেতু উৎপাদনের উপায়সমূহের একটা নির্দিষ্ট বিতরণ সম্পন্ন করেই উৎপাদনকে শুরু করতে হয় এবং এখান থেকেই যেহেতু নিষ্পন্ন হচ্ছে যে, অন্তত এই দিক থেকে বিতরণ উৎপাদনের পূর্ববর্তী এবং পূর্বশর্ত, তাহলে অবশ্যম্ভাবী উত্তর হবে উৎপাদনের অন্তর্গত মুহূর্তকে যারা রূপ প্রদান করে। শুরুতে তাদের আবির্ভাবকে স্বতস্ফূর্ত ও প্রাকৃতিক মনে হতে পারে কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রাকৃতিকতা অতিক্রম করে তারা রূপান্তর লাভ করে। ঐতিহাসিক শর্ত হিশাবে এবং ইতিহাসের এক পর্যায়ে যদি তাদের আবির্ভাব ঘটে উৎপাদনের প্রাকৃতিক পূর্বশর্ত হিশাবে, তবে আরেক পর্যায়ে তারা আসে তার ঐতিহাসিক ফলাফল হিশাবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে তাদের পরিবর্তন ঘটাতে থাকে ক্রমাগত। যেমন, মেশিনপত্রাদির প্রয়োগ ক্রমান্বয়ে উৎপাদনের সরঞ্জাম এবং উৎপন্ন বস্তুর বিতরণ পদ্ধতির বদল ঘটিয়ে চলেছে। বর্তমানের বৃহৎ ভূসম্পত্তি নিজেই আধুনিক বাণিজ্য ও আধুনিক শিল্পকারখানার পরিণতি-ফল। কৃষিতে আধুনিক শিল্পকৌশল প্রয়োগের কারণও তাই।

ওপরে যেসকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো শেষাবধি তাদের বিধৃত করা যায় উৎপাদনের সাধারণ ঐতিহাসিক সম্পর্ক সমূহের ভূমিকা এবং সাধারণভাবে ইতিহাসের গতির-সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রশ্ন হিশাবে। স্পষ্টতই এ প্রশ্নের উত্তর উৎপাদন প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ ও বিচারের সঙ্গে জড়িত।

তবুও যতো হাল্কাভাবে ওপরে এসব প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে একইভাবে খুব সংক্ষেপে এখানে তাদের আলোচনা হতে পারে। রাজ্য জয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিন ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। বিজয়ী জাতি কর্তৃক নিজের উৎপাদন পদ্ধতির অধীনে পরাজিতদের বশীভূত করা (যেমন, বর্তমান শতাব্দীতে ইংরেজের অধীনে আয়ারল্যান্ড ও ভারতবর্ষের কিছু অংশ); অথবা, কর নিয়ে খুশি থেকে পরাজিত জাতির উৎপাদন ব্যবস্থাকে অক্ষত রেখে দেয়া (যেমন তুর্কী ও রোমানরা) অথবা, দু'য়ের

মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে নতুন কিছু সংশ্লেষিত হওয়া, যেমন, জর্মান গোষ্ঠীর বিজয়, আংশিক ক্ষেত্রে)। এর ফলে যে নয়া বিতরণ-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে তার প্রতিটি ক্ষেত্র উৎপাদন ব্যবস্থাই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে—তা সে বিজিত জাতির, পরাজিতের অথবা দু'য়ের পারস্পরিকতা থেকে সৃষ্ট নতুন উৎপাদন ব্যবস্থাই হোক না কেন। যদিও বিতরণ উৎপাদনের এই নতুন পর্যায়ের পূর্বশর্ত হিশাবে আবির্ভূত হয়। বিতরণ এভাবে নিজেই উৎপাদনের উৎপন্নে পরিণত হয়। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক উৎপাদনের সার্বিক অর্থেই নয় বরং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উৎপাদন ব্যবস্থারও বটে।

মোঙ্গলরা রাশিয়ায় যে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছে তা তারা ঘটিয়েছে তাদের যে উৎপাদন ব্যবস্থা, সেই পশুপালন ব্যবস্থারই ধর্মানুযায়ী, — অবারিত প্রান্তর যে ব্যবস্থার প্রধান পূর্বশর্ত। ভূসম্পত্তি নির্ভর জর্মান-গোষ্ঠী, যাদের ঐতিহ্যে ছিলো ভূমিদাস ব্যবস্থা নির্ভর কৃষি, তারা তাদের ব্যবস্থাকে খুব সহজেই রোমানদের উপর চাপিয়ে দিতে পেরেছিলো, কারণ সেখানে ইতোমধ্যেই ভূসম্পত্তির কেন্দ্রীভবনের ফলে পুরনো কৃষি সম্পর্কের উৎখাত সম্পূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

লোকগৃহীত একটি ধারণা হচ্ছে যে, কোনো কোনো যুগে একটি জনগোষ্ঠী শুধু লুণ্ঠনের ওপরই বেঁচে ছিলো। কিন্তু লুণ্ঠনকে সম্ভব করে তুলতে হলে অবশ্যই লুণ্ঠনযোগ্য বস্তুর উপস্থিতি চাই—অর্থাৎ চাই উৎপাদন। এবং লুণ্ঠনের পদ্ধতি নিজেই পাল্টা উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা নির্ণীত হয়। পেশায় মাল-মজুতকারী একটি জাতিকে রাখাল জাতির মতো একই ধরনে লুণ্ঠন সম্ভব নয়।

একজন দাসকে চুরি করা সরাসরি উৎপাদনের যন্ত্র চুরি করার শামিল। কিন্তু আবার যে দেশের জন্য দাসচুরি সংঘটিত হলো সে দেশকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা চাই যা দাসশ্রমের উপযোগী (যেমন, আমেরিকা), কিম্বা এমন উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে দাস শ্রমের সঙ্গে যার সঙ্গতি রয়েছে।

উৎপাদনের একটি উপকরণকে আইন চিরস্থায়ী করে তুলতে পারে। যেমন, কোনো কোনো পরিবারের ভূসম্পত্তি। এ আইনগুলো অর্থনীতিক তাৎপর্য অর্জন করে কেবল তখনই যখন বৃহৎ ভূসম্পত্তি সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখতে সক্ষম; যেমন, ইংল্যান্ড। ফ্রান্সে বৃহৎ ভূসম্পত্তির উপস্থিতি সত্ত্বেও ক্ষুদ্রায়তন কৃষি

খামারগুলো টিকে রয়েছিলো, ফলে ফরাসি বিপ্লব বৃহৎ ভূসম্পত্তি ধ্বংস করেছে কিন্তু আইন কি ক্ষুদ্রায়তন খামারগুলোকে চিরস্থায়িত্ব দিতে পারে? আইন বজায় থাকা সত্ত্বেও মালিকানা কিন্তু পুনরায় কেন্দ্রীভূত হচ্ছে বিতরণ সম্পর্ক স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে আইনের প্রভাব এবং উৎপাদনে তজ্জনিত প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি ক্ষেত্রবিশেষের প্রতিটি উদাহরণ নিয়ে নির্ধারণ করা আবশ্যক।

বিনিময় শেষের পর্যায় ও বিচলন

বিনিময় ও উৎপাদন

বিচলন নিজে বিনিময়েরই একটি বিশেষ মুহূর্ত কেবল অথবা এ হচ্ছে সামগ্রিকভাবে বিবেচিত বিনিময়।

যতোটুকু পর্যন্ত বিনিময় একদিকে উৎপাদন কর্তৃক নির্ণীত বিতরণ আর অন্যদিকে ভোগের মধ্যকার পারস্পরিক প্রয়োজনের মুহূর্ত—কিন্তু আবার যতোটুকু পর্যন্ত ভোগ উৎপাদনেরই অন্তর্গত মুহূর্ত হিশাবে আবির্ভূত—বিনিময় স্পষ্টত ঠিক ততোটুকু পর্যন্তই উৎপাদনের মুহূর্ত হিশাবে গণ্য।

প্রথমত এটা পরিষ্কার যে, উৎপাদনের অন্তর্গত কর্মকাণ্ডের ভেতর যে তৎপরতা ও দক্ষতার বিনিময় ঘটে তা সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তা প্রধানত উৎপাদনেরই গঠনমূলক উপাদান। দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন বস্তুর বিতরণের বেলাতেও কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য, যতোটুকু অবধি বিনিময় উৎপন্ন বস্তুর পূর্ণতা প্রদান ও সরাসরি ভোগোপযোগী করে তোলার মাধ্যম, ততোটুকু পর্যন্ত বিনিময় উৎপাদনের অভ্যন্তরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ড হিশাবে বিবেচিত। তৃতীয়ত, মজুতদারের সঙ্গে মজুতদারের তথাকথিত বিনিময় নিজস্ব সাংগঠনিক কারণে সম্পূর্ণভাবেই উৎপাদন কর্তৃক নির্ণীত হয়, আর একই সঙ্গে বিনিময় নিজে সম্পাদিত হয় উৎপাদনক্রিয়া হিশাবে—সে কারণেও বিনিময় উৎপাদন থেকে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন পর্যায় হিশাবে আবির্ভূত হয় শুধুমাত্র সেই শেষ পর্যায়ে যখন উৎপন্ন বস্তুর বিনিময় সাধিত হয় সরাসরি ভোগের প্রয়োজনে। কিন্তু (১) শ্রমবিভাগ না থাকলে বিনিময়েরও অস্তিত্ব থাকতে পারে না, (২) ব্যক্তিগত বিনিময় ব্যক্তিগত উৎপাদনের পূর্ব অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, (৩) বিনিময়ের তীব্রতা, ব্যাপ্তি ও পদ্ধতি উৎপাদনের বিকাশ ও বিন্যাস কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যেমন, শহর ও গ্রামের মধ্যকার বিনিময়, গ্রামের

বিনিময় এবং শহরের অভ্যন্তরে বিনিময়, প্রভৃতি। বিনিময়ের প্রতিটি মুহূর্ত হয় উৎপাদনের অভ্যন্তরে সংগঠিত হচ্ছে বা উৎপাদন কর্তৃক নির্ণীত হচ্ছে।

আমরা কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌছাচ্ছি না যে উৎপাদন, বিতরণ, বিনিময় ও ভোগ পরস্পর অভিন্ন, বরং তারা প্রত্যেকে এক সামগ্রিকতার সদস্য যার ঐক্যের মধ্যে ভিন্নতা নিয়ে তারা বিরাজমান। আপনকার বিপরীতবাচক (Antithetical) সংজ্ঞানুযায়ী উৎপাদন নিজের ওপর আধিপত্য বজায় রাখে তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর মুহূর্তগুলোর ওপরও উৎপাদনের আধিপত্য বিদ্যমান থাকে। পুরো প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে শুরু হতে হলে পুনরায় উৎপাদনে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। বিনিময় ও ভোগ যে প্রধান হতে পারে না, তাতো এমনিতেই স্পষ্ট। তেমনি, বিতরণও উৎপন্ন বস্তুর বিতরণ হিশাবে প্রাধান্য পেতে পারে না। উৎপাদনের উপকরণসমূহের বিতরণ হিশাবে বিতরণ উৎপাদনেরই অন্তর্গত মুহূর্ত। নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন অতএব ভোগ, বিতরণ ও বিনিময় এবং এইসব বিভিন্ন মুহূর্তের মধ্যকার সম্পর্ক সমূহের ধরনকে বিশেষত্ব প্রদান করে। তবে এটা ঠিক যে, উৎপাদনের এই একপেশে রূপকে শুধু বিচার করলে উৎপাদন অপরাপর মুহূর্ত দ্বারাও নির্ণীত হয়। যেমন, বাজার—অর্থাৎ বিনিময়ের এলাকা যদি প্রসারিত হয় তখন উৎপাদনও পরিমাণে বেড়ে যায়, এবং এর বিভিন্ন শাখার মধ্যকার পার্থক্যও গভীর হয়ে ওঠে। বিতরণে বদল ঘটলে উৎপাদনেও বদল ঘটে—যেমন পুঁজির কেন্দ্রীভবন, শহর ও গ্রামের মধ্যে জনসংখ্যার বিতরণে বদল, প্রভৃতি। অবশেষে ভোগের আকাঙ্ক্ষাও উৎপাদনের ওপর নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন মুহূর্তের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ সমগ্রের ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য।

[৩] অর্থশাস্ত্রের পদ্ধতি

রাজনৈতিক-অর্থনীতিকভাবে আমরা যখন কোনো একটি দেশের বিচার করি তখন আমরা শুরু করি তার জনসাধারণ, বিভিন্ন শ্রেণীতে তাদের অন্তর্ভুক্তি শহর গ্রাম, বন্দর উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা, আমদানী ও রপ্তানী, বার্ষিক উৎপাদন ও ভোগ, পণ্যের দাম, প্রভৃতি থেকে।

বাস্তব ও মূর্তসত্য (Concrete) এবং সত্যিকার পূর্বশর্ত থেকে শুরু করাটাই সঠিক বলে মনে হয়, যেমন অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে জনসাধারণ—সকল উৎপাদন কর্মকাণ্ডের যা ভিত্তি ও সম্পাদক। সে যাইহোক আগ বাড়িয়ে পরীক্ষা করলে ধরা পড়ে যে শুরু করার এ পদ্ধতি ভুল। জনসাধারণ একটি বিমূর্ত শব্দ, যদি ধরা যাক, যে শ্রেণীর তারা অন্তর্ভুক্ত সে শ্রেণীর প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা থেকে বাদ রেখেছি। পাল্টা এই শ্রেণীগুলিও আবার অর্থহীন বিমূর্ত শব্দ, যদি যেসব উপাদানের উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল সেসব উপাদান সম্পর্কে আমরা পরিচিত না থাকি—যেমন মজুরিশ্রম, পুঁজি প্রভৃতি। এই শেষোক্তরাও আবার পাল্টা বিনিময়, শ্রমবিভাগ, দাম প্রভৃতির পূর্ব অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। যেমন মজুরিশ্রম ছাড়া মূল্য ছাড়া মুদ্রা, দাম প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে পুঁজি কিছুই না। অতএব আমরা যদি জনসাধারণ থেকে আলোচনা শুরু করি তাহলে সমগ্র বিষয় সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি হবে বিশৃঙ্খল এবং তখন সেই দরুনে বিচার বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে আরো সরল প্রত্যয়ে গিয়ে পৌছতে হবে আমাদের, যেতে হবে উপকল্পিত মূর্তসত্য থেকে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিমূর্ততায়, যতোক্ষণ না আমরা সরলতম প্রত্যয়ে গিয়ে পৌছুই। সেখান থেকে ফের বিপরীত যাত্রায় আমাদের ফিরে আসতে হবে জনসাধারণের আলোচনায়, কিন্তু এবার আর সমগ্র বিষয়ে বিশৃঙ্খল ধারণা নিয়ে নয়, বিভিন্ন প্রত্যয় ও সম্বন্ধের সমৃদ্ধতায় পরিস্ফূট সমগ্রের আদল নিয়ে। আর্থশাস্ত্রকে নিজের উন্মেষের সময় প্রথম ধরনের যাত্রাপথ পরিক্রম করতে হয়েছে। যেমন সতরো শতাব্দীর অর্থশাস্ত্রবিদরা সবসময়ই জনসাধারণ, জাতি, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসমূহ প্রভৃতি জীবন্ত বিষয়সমগ্র নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন কিন্তু তাঁদের বিশ্লেষণজনিত আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তাঁরা উপসংহারে পৌছুতেন বিমূর্ত—সাধারণ সম্পর্কবাচন কতিপয় প্রত্যয়ে—যেমন শ্রমবিভাগ, মুদ্রা, মূল্য প্রভৃতি। যখনি এসব বিশেষ মুহূর্ত কমবেশি গভীরভাবে বিমূর্ততা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তখনই শুরু হয়েছে অর্থশাস্ত্রের পদ্ধতিগত বিন্যাস। যার আরম্ভ শ্রম, শ্রমবিভাগ, আকাঙ্ক্ষা, বিনিময় প্রভৃতি সহজ-সরল সম্পর্ক থেকে, আর ক্রমে যা উন্নীত হয়েছে রাষ্ট্র, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিনিময় এবং বিশ্ববাজার প্রভৃতির আলোচনায়। স্পষ্টত এই শেষের পদ্ধতিটিই বৈজ্ঞানিক। মূর্তসত্যের মূর্ততার কারণ হচ্ছে তা বিভিন্ন প্রত্যয়ের কেন্দ্রীভবন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। সুতরাং চিন্তার প্রক্রিয়ায় এর আবির্ভাব ঘটে কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়া হিশাবে

ফলাফল হিশাবে—পার্থক্যসূচক আরম্ভ (Point of Departure) হিশাবে নয়, যদিও বাস্তবে এটা সত্যিসত্যিই পার্থক্যসূচক আরম্ভ। পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির জন্যও তা অতএব পার্থক্যসূচক আরম্ভই বটে। প্রথম প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি উঠে গিয়ে বিমূর্ত প্রত্যয়াদি জন্ম লাভ করে, দ্বিতীয়ের ক্ষেত্রে বিমূর্ত প্রত্যয়সমূহ চিন্তা-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মূর্তসত্যকে পুনরুৎপাদিত করার দিকে নিয়ে যায়। এ পথে চলতে গিয়ে হেগেল বিভ্রান্ত হয়েছিলেন বাস্তবকে চিন্তা-প্রক্রিয়ার ফলাফল ভেবে—যে ফলাফল নিজেই নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে, নিজের গভীরতা স্বতোপ্রমাণ করে, এবং নিজের অভ্যন্তর থেকে নিজেকে নিজস্বকরণে অভিব্যক্ত করে তোলে। অথচ বিমূর্ত থেকে মূর্তসত্যে উত্থিত হবার এ প্রক্রিয়া চিন্তার আপন একটি উপায় মাত্র, যার ভেতর দিয়ে চিন্তা মূর্তসত্যকে আত্মস্থ করে। এবং চিন্তার অভ্যন্তরে তাকে মূর্তসত্য হিশাবে পুনরুৎপাদিত করে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া কখনোই মূর্ত-সত্যের সত্যিকারের অস্তিত্বলাভের প্রক্রিয়া হতে পারে না। অর্থশাস্ত্রের একটি খুব সরল প্রাত্যয়িক সংজ্ঞার কথা ধরা যাক; যথা—বিনিময় মূল্য, যা জনসাধারণের পূর্ব অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, তাছাড়া এমন জনসাধারণ যারা নির্দিষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদনে নিয়োজিত, এবং নির্দিষ্ট ধরনের পরিবার, কৌম বা রাষ্ট্রের আওতাবদ্ধ। আগে থেকেই বিরাজমান মূর্ত সত্যের সপ্রাণ সমগ্রতার অভ্যন্তরে এক পেশে সম্বন্ধে যুক্ত বিমূর্তায়ন না হয়ে এ সংজ্ঞাটি কখনোই টিকে থাকতে পারে না। অথচ, পক্ষান্তরে, প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা হিশাবে বিনিময়ের অস্তিত্ব সেই পৌরাণিক অতীত অবধি দ্রষ্টব্য। সুতরাং একধরনের চেতনায়, যার বৈশিষ্ট্যবাচক উদাহরণ হচ্ছে দার্শনিক চেতনা—যে চেতনা প্রাত্যয়িক চিন্তার প্রক্রিয়াকেই সত্যিকারের সপ্রাণ মানুষ হিশাবে গণ্য করে এবং প্রাত্যয়িক জগতই যার কাছে এক মাত্র বাস্তবতা হিশাবে স্বীকৃত-সেই চেতনায় প্রাত্যয়িক সংজ্ঞাসমূহের চলাচলই উৎপাদন সংঘটনের সত্যিকার প্রক্রিয়া হিশাবে আবির্ভূত। তবে দুর্ভাগ্যজনক কারণে এ প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে একটা ধাক্কার দরকার হয়ে পড়ে, যার পরিণতি ফল হচ্ছে এই জগত।

কিন্তু এ আবার ঘুরিয়ে একই কথা বলার শামিল। এ কথা ততোটুকুই সত্য যতোটুকু মূর্তসত্যের সমগ্রতাকে চিন্তার সমগ্রতা—চিন্তায় রূপায়িত মূর্তসত্যের সমগ্রতা, অর্থাৎ চিন্তা ও উপলব্ধিকরণ প্রক্রিয়ার ফল হিশাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এটা কোনোমতেই

পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধিকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে একটি প্রত্যয়ের নিজেকে নিজে জন্মদান ও চিন্তা হতে পারে না, বরং এ হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধিকরণকে প্রত্যয়ীভূত করার প্রক্রিয়া। চিন্তার সমগ্রতা হিশাবে মস্তিষ্কে যা আবির্ভূত হয় তা সক্রিয় চিন্তা নিজে একমাত্র যে পদ্ধতিতে সক্ষম সে পদ্ধতিতে জগতকে আত্মস্থ করে; এ পদ্ধতি শৈল্পিক, ধর্মীয়, প্রায়োগিক এবং মানসিক আত্মস্থকরণ প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন। সত্যিকারের ব্যক্তি আগের মতোই মস্তিষ্কের বাইরে নিজের স্বয়ম্ভূ অস্তিত্ব বজায় রাখে; বিশেষত যতোক্ষণ মস্তিষ্কের আচরণ শুধুমাত্র কল্পনায়, অর্থাৎ নিছক তত্ত্বে নির্দিষ্ট থাকে, অতএব তাত্ত্বিক পদ্ধতি বিচারের সময়েও ব্যক্তির—সমাজের পূর্ব অস্তিত্ব সবসময়ই মনে রাখতে হবে।

কিন্তু এইসব সরল প্রত্যয়সমূহের নিজস্ব ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক অস্তিত্ব রয়েছে নাকি যা মূর্তসত্যেরও আগের? এটা নির্ভর করে। যেমন, হেগেল **ফিলসফি অফ রাইট** গ্রন্থে সঠিকভাবেই অধিকার থেকে শুরু করেছেন, এটা হচ্ছে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সরলতম আইনি সম্পর্ক। কিন্তু পারিবারিক বা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগে অধিকার বলে কিছু থাকতে পারে না। এসব সম্পর্ক অনেক বেশি মূর্ত। সে যাই হোক এটা অবশ্য বলা বেঠিক হবে না যে, এমনসব পরিবার বা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকতে পারে যাদের নিছক **অধিকার** রয়েছে। কিন্তু সম্পত্তি নেই। এইসব সরল প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা তাহলে সম্পত্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে অজটিল পরিবার বা গোষ্ঠীসমূহের সম্পর্কের অভিব্যক্তি হিশাবে আবির্ভূত হয়েছে। বিকাশের উচ্চপর্যায়ভুক্ত সমাজে তাদের আবির্ভাব ঘটে বিকশিত সংগঠনের সরলতম সম্পর্কের অভিব্যক্তি হিশাবে। কিন্তু সেই মূর্ত অবসংগঠন—অধিকার যার অন্তর্গত সম্পর্কের অভিব্যক্তি, তার অস্তিত্ব আগে থেকেই বিরাজমান থাকে। কোনো-কিছু অধিকার করে আছে এমন এক আদিম মানুষের কল্পনা করা সম্ভব, কিন্তু সেক্ষেত্রে অধিকার কোনো আইনি সম্পর্ক হতে পারে না।

একথা সঠিক নয় যে, অধিকার ঐতিহাসিকভাবে পরিবার হিশাবে বিকাশ লাভ করে। অধিকার বরং সবসময়ই এই "আরো মূর্ত আইনি সংজ্ঞার" পূর্ব অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। সে যাইহোক, এ সত্য সব-সময়ই বজায় থাকে যে, সরল প্রাত্যয়িক সংজ্ঞাগুলো সেসব সম্পর্কেরই অভিব্যক্তি যার মধ্যে অল্প বিকশিত মূর্ত সত্য হয়তো আরো বহুমুখী সম্পর্ক ও সংযোগ ব্যক্ত করার আগে ইতোমধ্যে নিজেকে নিষ্পন্ন করে নিয়েছে, যেসব সম্পর্ক ও সংযোগকে মন আরো মূর্ত প্রাত্যয়িক সংজ্ঞায়

প্রকাশ করে। আবার আরো অধিক মূর্ত সত্য সেই একই প্রাত্যয়িক সংজ্ঞাকে নিজের অধীনস্থ সম্পর্ক হিশাবে বজায় রাখে। পুঁজির অস্তিত্বের আগে, ব্যাংকের অস্তিত্বের আগে, মজুরি শ্রমেরও অস্তিত্বের আগে মুদ্রার অস্তিত্ব থাকতে পারে, এবং ঐতিহাসিকভাবে ছিলোও তাই। অতএব এক্ষেত্রে একথা বলা চলে যে, সরলতম প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা অল্প বিকাশপ্রাপ্ত সমগ্রের প্রধান সম্পর্ককে ব্যক্ত করতে সক্ষম, অথবা তা অধিক বিকাশপ্রাপ্ত সমগ্রের অধীন সম্পর্ক-কেও ব্যক্ত করতে পারে—ইতোমধ্যেই যে সম্পর্ক আরো মূর্ত প্রাত্যয়িক-সংজ্ঞা অনুযায়ী সমগ্রের আরো অধিক বিকাশ প্রাপ্তিরও আগে ঐতিহাসিক অস্তিত্ব লাভ করছে—যে বিকাশ ঘটেছে আরো মূর্ত প্রাত্যয়িক সংজ্ঞার ভেতর। যে ধারা ব্যক্ত, সেই ধারার নিয়মে। এইদিক থেকে সরল থেকে জটিল পর্যায়ে উত্থিত বিমূর্ত চিন্তার পথ পরিক্রমা সত্যিকারের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

অন্যদিক থেকে একথাও বলা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিকভাবে অপরিণত হওয়া সত্ত্বেও খুবই বিকশিত সমাজের অস্তিত্ব রয়েছে, অর্থ-ব্যবস্থায় উচ্চতম পর্যায়—যেমন সহযোগিতা, উন্নত শ্রমবিভাগ, প্রভৃতি যে সমাজে লক্ষণীয়, অথচ যেখানে মুদ্রার প্রচলন অনুপস্থিত—পেরু হচ্ছে এ ধরনের সমাজের উদাহরণ; স্লাভ গোষ্ঠীও একটি। মুদ্রা ও বিনিময়ের নির্ধারক ভূমিকা থাকলেও প্রতিটি গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে মুদ্রা আর বিনিময়ের ভূমিকা খুবই গৌণ; মুদ্রার ভূমিকা কেবল সীমান্তে—অন্যদের সঙ্গে মাল আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে। বিনিময়কে গোষ্ঠী-সমাজের আদি, অকৃত্রিম ও সাংগঠনিক উপাদান হিশাবে গণ্য করে কৌম সমাজের অভ্যন্তরে একে স্থাপন করা নেহায়েতই একটা ভুল।

বরং আদিতে এর উদ্ভব ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সংযোগের মধ্য থেকে, একটি সমাজের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে নয়। তাছাড়া, মুদ্রা যদিও বহুকাল আগে থেকেই সর্বত্র একটা ভূমিকা পালন করে আসছে, তা সত্ত্বেও প্রাচীন কালে প্রধান উপাদান হিশাবে এর ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিলো কতিপয় একপেশেভাবে বিকশিত জাতিগুলোর মধ্যে—বাণিজ্য-নির্ভর জাতিগুলোতে। এবং এমনকি প্রাচীন সভ্যতায় সবচেয়ে উন্নত অংশ গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে মুদ্রার পরিপূর্ণ বিকাশ—বুর্জোয়া সমাজ যে বিকাশের পূর্ব অস্তিত্ব জ্ঞাপক, তাদের বিলুপ্তির পর্যায়েই কেবল আবির্ভূত হয়েছিলো। এই সরল প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা তার সম্পূর্ণ তীব্রতা নিয়ে অতএব ইতিহাসে আবির্ভূত হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে বিকশিত

পর্যায়ে। একে কখনোই সবধরনের অর্থনীতিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে কষ্ট করে উঠে আসতে হয় নি। এমনকি রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিকাশের পর্যায়েও সমাজের ভিত্তি ছিলো জিনিসপত্রের মাধ্যমে কর ও প্রাপ্য পরিশোধ। সেখানে শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর মধ্যেই কেবল মুদ্রাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিলো। এবং তা কখনোই তবু শ্রমের সবটা আত্মসাৎ করে বসে নি। অতএব অধিকতর মূর্তসত্যের আগে সরল প্রাত্যয়িক সংজ্ঞার ঐতিহাসিক উপস্থিতি থাকলেও এর পরিপূর্ণ বিকাশ (সমৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির দিক থেকে) কেবল সমাজের একত্রিত সমগ্রতার ভেতরই অর্জন সম্ভব, আবার অধিকতর মূর্ত প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা অল্প বিকশিত সমাজেই বেশি বিকাশ লাভ করে।

শ্রমকে খুব সহজ-সরল প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা বলে মনে হয়। শ্রম-সংক্রান্ত ধারণার এই সর্ববাচক রূপ—এই নিছক শ্রম—বহু আগের পুরনো। তা সত্ত্বেও শ্রমের এই সরল রূপ যখন অর্থশাস্ত্রীয় ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন যেসব সম্পর্ক এই বিমূর্তায়নের জনক, সেসব সম্পর্কের মতোই 'শ্রম' অতিসাম্প্রতিক এক প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা। যেমন মুদ্রাতান্ত্রিক পদ্ধতি (Monetary System) [৯] এখনো সম্পদকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে, বাইরের বস্তু হিশাবে মুদ্রার ভেতর অবস্থিত বলে গণ্য করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বাণিজ্যতন্ত্র ও কারখানাতন্ত্র এ তন্ত্রের চেয়েও বড়ো এক ধাপ আগুয়ান, কারণ তারা নৈর্ব্যক্তিক বস্তুকে সম্পদের উৎস হিশাবে চিহ্নিত না করে ব্যক্তিক সক্রিয়তা—অর্থাৎ বাণিজ্যিক ও কারখানা-উৎপাদনের সক্রিয়তা হিশাবে গণ্য করে। যদিও তাদের এ সক্রিয়তার ধারণা সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে বন্দী, যা হচ্ছে মুদ্রা বানানোর সক্রিয়তা। এর বিপরীতে ফিজিওক্রেটরা সম্পদের স্রষ্টা হিশাবে এক বিশেষ ধরনের শ্রম—কৃষিকে, উপস্থাপন করেছেন। সম্পদ এক্ষেত্রে আর মুদ্রার ছদ্মাবরণে আবৃত নয়, বরং তা উপস্থাপিত হচ্ছে সর্বজনীন উৎপন্ন বস্তু হিশাবে—অর্থাৎ শ্রমের সাধারণ ফলাফল হিশাবে। যে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই সক্রিয়তাকে বোঝা হয়েছে তার সাথে সমন্বয় রাখতে গিয়ে উৎপন্ন বস্তু সবসময়ই প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত বলে বিবেচিত, অর্থাৎ এ হচ্ছে কৃষি থেকে উৎপন্ন বস্তু, মাটির একান্তই নিজস্ব উৎপাদনের ফলাফল।

আদম স্মিথের জন্য এ এক বিরাট আগ বাড়ানো পদক্ষেপ যে, তিনি সম্পদ সৃষ্টির সক্রিয়তার ওপর থেকে সীমা-নির্দিষ্টকারক সমস্ত বাধ্যবাধকতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। শুধুমাত্র কারখানা, বাণিজ্য বা

কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমই নয়, এসবকে তো বটেই, অন্যদিকে সর্বজনীন শ্রমকেও তিনি ত্যাগ করেছেন। সম্পদসৃষ্টি-ক্রিয়ার বিমূর্ত সর্বজনীনতাসহ আমাদের কাছে এসেছে সম্পদ হিশাবে সংজ্ঞায়িত বস্তুময় সত্তার সাক্ষাৎ উৎপন্ন বস্তু বা সাক্ষাৎ শ্রম, বস্তুময়তাপ্রাপ্ত শ্রম। মাঝেমধ্যে ফিজিওক্রেটদের পদ্ধতির মধ্যে আদম স্মিথ নিজেও কিভাবে পতিত হচ্ছেন তা লক্ষ করলে এই উত্তরণ যে কী পরিমাণ দুঃসাধ্য ছিলো তা বোঝা যায়। এখন, এটা মনে হতে পারে যে, এর ফলে যা অর্জিত হয়েছে তা হচ্ছে সবচেয়ে সরল ও প্রাচীনতম যে-সম্পর্কের ভিত্তিতে যেকোনো ধরনের সমাজে মানুষ উৎপাদকের ভূমিকা পালন করে, সে সম্পর্কের বিমূর্ত অভিব্যক্তি আবিষ্কার। একদিক থেকে কথাটা সত্যি। অন্যদিক থেকে তা আবার নয়। বিশেষ ধরনের শ্রমের প্রতি অমনোযোগ শ্রমের সত্যিকার বিকশিত সমগ্রতার পূর্ব অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, যেক্ষেত্রে শ্রমের বিশেষ একটি ধরনের প্রাধান্য নেই। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই মূর্ত বিকাশের সম্ভাব্য সকল সমৃদ্ধির মধ্য থেকেই কেবল সবচেয়ে সর্বজনীন বিমূর্তায়নের উদ্ভব ঘটতে পারে, যেক্ষেত্রে একটি গুণ অনেকের বা প্রত্যেকের সাধারণ গুণ হিশাবে আবির্ভূত হয়। ফলে একটি মাত্র রূপে একে কল্পনা করার অবসান ঘটে। অন্যদিক থেকে শ্রমের এই বিমূর্তায়ন মূর্ত শ্রমের সামগ্রিকতা সম্পর্কে একটা মানসিক উৎক্ষেপ মাত্র নয়। বিশেষ ধরনের শ্রমের প্রতি অমনোযোগ সেই বিশেষ সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যেখানে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে এক ধরনের শ্রম ছেড়ে অন্য ধরনের শ্রমে বদলি হওয়া সম্ভব। এবং যেখানে শ্রমের বিশেষ ধরনটা হচ্ছে নিতান্তই একটা আকস্মিক ব্যাপার, অতএব তা মনোযোগযোগ্যই নয়। প্রাত্যয়িক সংজ্ঞায় বিধৃত শ্রমই শুধু নয় সত্যিকারের বাস্তব অবস্থায় শ্রম এখানে সর্বজনীন সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হিশাবে আবির্ভূত এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্বন্ধে তার সংযুক্ত থাকার অবসান ঘটেছে। এই ধরনের অবস্থা সবচেয়ে বেশি বিকাশ লাভ করেছে বুর্জোয়া সমাজের আধুনিক রূপের মধ্যে—যুক্তরাষ্ট্রে। এখানেই তাহলে প্রথম বারের মতো 'শ্রম' নিছক শ্রম—অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সরল শ্রমের বিমূর্তায়িত প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা দিয়ে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের আলোচনা সত্যিকারভাবে চালু হতে পারে। অতএব দাঁড়াচ্ছে এই যে, যদিও সরল বিমূর্তায়নকে সব ধরনের সমাজে প্রযোজ্য অত্যন্ত প্রাচীন সম্পর্কের অভিব্যক্তি হিশাবে ব্যক্ত করা হয়, তবুও সে সম্পর্ক সবচেয়ে আধুনিক সমাজের অন্তর্গত প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা হিশাবে

বিমূর্তায়িত হয়েই কেবল যথার্থতা লাভ করতে পারে। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এই বিশেষ ধরনের শ্রমের প্রতি অমনোযোগ, যা যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত, তাকে রুশদেশীয়দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা হিশাবেও তো ধারণা করা সম্ভব। কিন্তু সবকাজে ব্যবহার হওয়ার জন্য প্রাকৃতিকভাবে সমর্থ বর্বরজাতি এবং সবকিছুতে নিজেদের নিয়োগ করতে সক্ষম সভ্যজাতি—এ দুয়ের মধ্যে যারপরনাই পার্থক্য রয়েছে। এবং আবার কার্যক্ষেত্রেও শ্রমের বিশেষ চরিত্রের প্রতি রুশদেশীয়দের অমনযোগ তাদের বিশেষ ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, বাইরে থেকে প্রভাব আরোপ করেই যাকে শিথিল করা সম্ভব।

শ্রম-সংক্রান্ত এই উদাহরণটি খুবই স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে, এমনকি অত্যন্ত বিমূর্ত প্রাত্যয়িক সংজ্ঞাগুলিও তাদের বিমূর্ততার গুণে সমস্ত যুগে বৈধ হওয়া সত্ত্বেও বিমূর্তায়নের এই বিশেষ চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকেই জন্ম লাভ করে, এবং কেবল এই সম্পর্কের জন্যই এবং সম্পর্কগুলোর মধ্যেই তাদের সম্পূর্ণ বৈধতা লাভ করে।

বুর্জোয়া সমাজ উৎপাদনের সবচেয়ে জটিল ও সবচেয়ে বিকশিত ঐতিহাসিক সংগঠন। এ সমাজের সম্পর্কসমূহ যেসব প্রাত্যয়িক সংজ্ঞায় ব্যক্ত হয়, এর গঠন কাঠামোকে যেভাবে অনুধাবন করা হয়, তা থেকে একই সঙ্গে এর আগে বিলুপ্ত অন্যসব সমাজের গঠনকাঠামো ও উৎপাদন সম্পর্ক সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের সুযোগ ঘটে—যে পুরনো সমাজের ধ্বংসাবশেষ ও উপাদান দিয়ে বুর্জোয়া সমাজ নিজেকে নির্মাণ করে, নিজের অভ্যন্তরে যেসব সমাজের অবিজিত আংশিক অবশেষ সে এখনো ধারণ করে আছে, যেসব সমাজের সূক্ষ্ম দিকগুলো তার মধ্যে স্পষ্ট তাৎপর্য নিয়ে বিকাশ লাভ করে, প্রভৃতি। প্রতিটি মানুষের শারীরিক গঠন বনমানুষের (Ape) শারীরিক গঠন বোঝার চাবিকাঠি। নীচু স্তরের প্রজাতির মধ্যে যে উচ্চস্তরীয় বিকাশ ঘটে তা কেবল তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব যখন উচ্চস্তরীয় বিকাশটা আমাদের জানা থাকে। বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থা এভাবে প্রাচীন ব্যবস্থা অনুধাবনের চাবিকাঠি। কিন্তু তা কোনোভাবেই সেসব অর্থশাস্ত্রবিদদের অনুকরণে হবে না যারা সমস্ত ঐতিহাসিক পার্থক্যকে নোংরাভাবে লেপে দিয়ে সব ধরনের সমাজের মধ্যে বুর্জোয়া সম্পর্ক আবিষ্কার করে বেড়ায়। ভূমি খাজনা সম্পর্কে জানা থাকলে করপ্রথা বা ভাগদান প্রভৃতি বোঝা সম্ভব, কিন্তু দুটো ব্যাপারকে গুলিয়ে ফেলা কারো উচিত নয়। আবার, বুর্জোয়া সমাজ যেহেতু বিকাশের একটি স্ববিরোধী রূপ, পুরনো সমাজ থেকে উদ্ভূত

সম্পর্কগুলো এর ভেতর অতএব সম্পূর্ণ খর্বাকার রূপ পরিগ্রহণ করে, এমনকি অনেক সময় তা হাস্যকর অনুকরণে পর্যবসিত হয়। যেমন কৌম সম্পত্তি। সুতরাং একথা যদিও ঠিক যে, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা অন্যসব ধরনের সমাজের সত্যকে ধারণ করে থাকে, তবু কথাটার তাৎপর্য এক চিমটে নুনের মতো তুচ্ছ করে গণ্য করা দরকার। পুরনো সমাজ এর মধ্যে বিকশিত হয়, খর্বাকার রূপ পরিগ্রহণ করে বা হাস্যকর অনুকরণে পর্যবসিত হয়ে উপস্থিত থাকে—কিন্তু সবসময়েই তা ঘটে মৌলিক পার্থক্যকে বজায় রেখে। তথাকথিত ঐতিহাসিক বিকাশের উপস্থাপন সাধারণত সেই নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত যাতে শেষতম রূপটি এর আগের রূপগুলোকে নিজের প্রতি অগ্রসরমান পদক্ষেপ হিশাবে গণ্য করে, এবং যেহেতু এই রূপ নিজ প্রণোদনায় খুব কম ক্ষেত্রেই এবং শুধুমাত্র বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সমালোচনা নিজে করতে সক্ষম, অতএব ঐতিহাসিক সেসব পর্যায়, যা এর চোখে বিনষ্টির যুগ হিশাবে আবির্ভূত হয়, তাকে বাদ দিলে পুরনো রূপগুলো অনুধাবিত হয় খুবই একপেশেভাবে।

নিজের পূর্বগামী লোককল্পনাগুলোর (Mythologies) নৈর্ব্যক্তিক অনুধাবনে খ্রিস্টধর্ম সহায়ক হয়েছে কেবল তখন, যখন এর নিজের আত্মসমালোচনাও কিছু পরিমাণ বিকশিত হয়েছে। অর্থাৎ কিনা সম্ভাবনার দিক থেকে। ঠিক তেমনি বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র সমস্ত প্রাচীন, প্রাচ্য প্রভৃতি অর্থব্যবস্থাগুলো অনুধাবনের স্তরে এসে পৌছেছে বুর্জোয়া সমাজের আত্মসমালোচনা শুরু হবার পর থেকেই কেবল, যতক্ষণ অবধি বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থা নিজেকে লোককাল্পনিক পুরোপুরি অতীতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে নি ততক্ষণ অবধি পুরনো অর্থ ব্যবস্থা সমূহের পর্যালোচনা, বিশেষত সামন্তব্যবস্থার সঙ্গে যার এখনো লড়াই চলছে—পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে খ্রিস্টধর্মের সমালোচনার সমতুল্য এবং তা ক্যাথালিকদের বিরুদ্ধে প্রটেস্ট্যান্টদের সমালোচনার সঙ্গেও তুলনীয়।

অন্য যেকোনো ঐতিহাসিক, সামাজিক বিজ্ঞানের মতো অর্থশাস্ত্রের প্রাত্যয়িক সংজ্ঞাগুলোর পারম্পর্য বিচারের সময় এটা ভুলে যাওয়া চলবে না যে, তাদের বিষয়—এবং বর্তমান আলোচনায় বুর্জোয়া সমাজ, সদাসর্বদা আগে থেকেই উপস্থিত থাকে, মাথায় আর বাস্তবে–যুগপৎ একই সঙ্গে, এবং এই প্রাত্যয়িক সংজ্ঞাগুলো সুতরাং এই অস্তিত্বপ্রাপ্ত সত্তাসমূহেরই রূপ, বিরাজমান বাস্তবতার চরিত্র, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংজ্ঞাগুলো এই বিশেষ সমাজের—বিষয়ের আংশিক দিককেই কেবল

ব্যক্ত করে, অতএব এই সমাজ কোনোমতেই সেই বিন্দু থেকে শুরু হয় না যেখানে থেকে বলা যেতে পারে এই হচ্ছে সমাজ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এ কথাটা মনে গেঁথে রাখা দরকার, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাত্যয়িক সংজ্ঞার বিন্যাস (Order) ও ক্রমানুবর্তিতায় এটা নির্ধারক ভূমিকা পালন করবে। উদাহরণ দেয়া যাক : ভূমি-খাজনা থেকে, ভূসম্পত্তি থেকে, স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে এমনসব সমাজে উৎপাদনের প্রাথমিক রূপ কৃষি থেকে আলোচনা শুরু করার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছুই মনে হয় না—কারণ এসবই মাটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সমস্ত উৎপাদন ও সকল প্রাণের উৎস হচ্ছে মাটি। কিন্তু এর চেয়ে ত্রুটিপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। যেকোনো ধরনের সমাজে উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসূচক ধরন আর সবকিছুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, যার সম্পর্ক আরসব কিছুর স্তর ও প্রভাব নির্ধারণ করে দেয়। এ হচ্ছে সেই সার্বিক দীপ্তি যা অন্যসব বর্ণকে প্লাবিত করে রাখে এবং তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে উদ্ভিন্ন করে তোলে। এই হচ্ছে সেই বিশেষ ইথার যা এর নিজের অভ্যন্তরে বস্তুময়তাপ্রাপ্ত বিভিন্ন সত্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) নির্ধারণ করে। যেমন পশুচারণজীবী মানুষের মধ্যে (যে পর্যায় থেকে সত্যিকারের বিকাশ শুরু হয়, শিকারি ও জেলে যে পর্যায়ের বাইরে) বিচ্ছিন্নভাবে একধরনের জমিকর্ষণ লক্ষ করা যায়, তবে মাঝেমধ্যে। এটাই ভূসম্পত্তির রূপ নির্ধারণ করে। এ রূপের ধরন যৌথ, এবং নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি কমবেশি সম্পৃক্তির তারতম্য অনুযায়ী এই যৌথ রূপের এই ধরন বজায় থাকে—যথা স্লাভদের যৌথ সম্পত্তি। কৃষিনির্ভর বসতির ক্ষেত্রে, যে বসতি ইতোমধ্যেই এক বিরাট পদক্ষেপ, যেখানে কৃষির প্রাধান্য বিদ্যমান, যেমন প্রাচীন ও সামন্তীয় সমাজ, এমনকি নিজের গঠন ও সম্পত্তির বিশেষ রূপের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শিল্পের ক্ষেত্রেও—ভূমি-মালিকানার চরিত্র বিদ্যমান। হয় এর উপর তারা পুরোপুরি নির্ভরশীল, যেমন, আদি রোমানরা, না হয় মধ্যযুগের মতো শহর ও শহরের অন্তর্গত সম্পর্কের ভেতর ভূমির সংগঠন সম্পর্ককে তারা অনুকরণ করে। মধ্যযুগে, বিশুদ্ধ মুদ্রাপুঁজির প্রসঙ্গ বাদ দিলে, পুঁজি নিজে কারিগরদের ঐতিহ্যগত যন্ত্রপাতিসমূহের রূপের মধ্যে ভূমিমালিকানার চরিত্রলক্ষণ নিয়ে বিদ্যমান ছিলো। বুর্জোয়া সমাজে ব্যাপারটি ঠিক বিপরীত। এক্ষেত্রে কৃষি ক্রমান্বয়ে আরো শিল্পের স্রেফ একটি শখায় পরিণত হয়েছে, এবং পুঁজির আধিপত্যও তার উপর

পুরোপুরি বিদ্যমান। ভূমি খাজনাও তদ্রূপ। ভূসম্পত্তি যে সমস্ত রূপের মধ্যে এখনো প্রধান নিয়ন্ত্রক, প্রাকৃতিক সম্পর্কের আধিপত্যই সেসব ক্ষেত্রে বজায় থাকে। পুঁজি যেখানে নিয়ন্ত্রক সেক্ষেত্রে সামাজিক-ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত সম্পর্কের আধিপত্য। পুঁজিকে বাদ দিয়ে ভূমিখাজনা অনুধাবন সম্ভব নয়, কিন্তু ভূমিখাজনাকে বাদ দিয়ে পুঁজিকে অনুধাবন করা অবশ্যই সম্ভব। বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হচ্ছে সবকিছুর উপর আধিপত্য বিস্তারকারী অর্থনীতিক শক্তি। পুঁজি থেকেই এর শুরু আর পুঁজিতেই এর সমাপ্তি, একে ধরতে হবে ভূসম্পত্তির আলোচনার আগেই। দু'য়ের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক দিক পর্যবেক্ষণের পর তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।

সুতরাং অর্থশাস্ত্রের প্রাত্যয়িক সংজ্ঞাগুলো ইতিহাসে যে পারম্পর্য বজায় রেখে নির্ধারক হতে পেরেছে সে-ভাবেই তাদের একের পর এক অনুসরণ করাটা হবে নিষ্ফল আর ভ্রান্ত। বরং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে তারা একে অপরের সঙ্গে যেভাবে সম্পর্কায়িত সেভাবেই তাদের পারম্পর্য নির্ণীত। যা কিনা তাদের প্রাকৃতিক পারম্পর্য বা ঐতিহাসিক বিকাশের ধারার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ক্রমানুবর্তিতার সাক্ষাৎ বিপরীত। ক্রমানুবর্তী বিভিন্ন সামাজিক রূপের ভেতর অর্থনৈতিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক অবস্থানটা আসল লক্ষ্য নয়, এমনকি 'চিন্তায়' (প্রুধোঁ) তাদের পারম্পর্যও নয় (ঐতিহাসিক গতিপ্রক্রিয়া বিষয়ে যা এক ঘোলাটে কল্পনা), বরং আসল কথা হলো আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে তাদের সম্পর্ক। যে বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে (বিমূর্তবাচক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী) পুরনো জগতে বণিক জাতি—ফিনিসিয়ান, কোথানিজিনিয়ান—আবির্ভূত হয়েছিলো তার নির্ধারক ভিত্তি ছিলো কৃষিজীবীদের আধিপত্য। এসব ক্ষেত্রে পুঁজি, বাণিজ্যে-লিপ্ত পুঁজি অথবা মুদ্রাপুঁজির বিমূর্ততায় হাজির হচ্ছে একান্তই সেসব ক্ষেত্রে যেখানে পুঁজি এখনো সমাজের প্রধান উপাদান হয়ে উঠতে পারে নি। মধ্যযুগের কৃষিনির্ভর সমাজগুলোতে লমবার্ড ও ইহুদীদের অবস্থানও ছিলো একই রকম।

একই প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে যে বিভিন্ন অবস্থান পরিগ্রহণ করে তার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজের একটি শেষতম রূপ, **জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি**।

যাইহোক, শুরুতে এর আবির্ভাব ঘটেছে বিশেষ সুযোগ সুবিধে পাওয়া বিশাল একচেটিয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে।

সতেরো শতাব্দীতে অর্থশাস্ত্রবিদদের রচনার মধ্যে জাতীয় সম্পদের ধারণা ঢুকে পড়েছিলো, আঠারো শতক অবধিও তার জের চলেছে সেই ধারণার মধ্যে যে সম্পদ শুধু রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করার জন্যই উৎপাদিত হয় আর রাষ্ট্রের ক্ষমতাও এই সম্পদের সঙ্গে আনুপাতিক সম্বন্ধে যুক্ত। এটা তখনো প্রচলিত সেই অবচেতন শঠতার নামান্তর যাকে উপলক্ষ করে সম্পদ ও সম্পদের উৎপাদন আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হিশাবে ঘোষিত হয়েছিলো এবং অবশেষে এসব রাষ্ট্রকে সম্পদ উৎপাদনের উপায়ে পর্যবসিত করে ফেলেছিলো।

পারম্পর্যতা তাহলে স্পষ্টতই এভাবে রক্ষিত হবে (১) সাধারণ বিমূর্ত সংজ্ঞা—যা সব ধরনের সমাজেই কমবেশি রূপ লাভ করেছে তবে শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত অর্থে (২) সেসব প্রাত্যয়িক সংজ্ঞা বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠন করে এবং যার উপর প্রধান শ্রেণীগুলো দাঁড়িয়ে আছে। পুঁজি, মজুরিশ্রম, ভূসম্পত্তি। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। শহর ও গ্রাম। প্রধান তিনটি সামাজিক শ্রেণী। তাদের মধ্যকার বিনিময়। বিচলন। ঋণ ব্যবস্থা (ব্যক্তিগত) (৩) রাষ্ট্রের রূপের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের কেন্দ্রীভবন। এর নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক থেকে বিষয়টি দেখা। 'অনুৎপাদক' শ্রেণী। ট্যাক্স, রাষ্ট্রীয়, ঋণ, পাবলিক ঋণ। জনসাধারণ। উপনিবেশ দেশান্তর (৪) আন্তর্জাতিক উৎপাদনের সম্পর্ক। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ। আন্তর্জাতিক বিনিময়। রপ্তানী ও আমদানী। বিনিময় হার (৫) বিশ্ববাজার ও সংকট।

[৪] উৎপাদন। উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদন-সম্পর্ক ও বিচলন-সম্পর্ক। রাষ্ট্রের রূপ এবং উৎপাদন ও বিচলন-সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কায়িত চৈতন্যের রূপ। আইনি সম্পর্ক। পারিবারিক সম্পর্ক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যেসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হবে এবং ভুলে যাওয়া চলবে না।

(১) যুদ্ধ বিকাশ লাভ করেছে শান্তির আগে; বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত হবার আগে যুদ্ধ ও সেনাবাহিনী প্রভৃতির কারণে যেভাবে কিছু অর্থনৈতিক সম্পর্ক—যেমন মজুরিশ্রম, মেশিনপত্র প্রভৃতি অস্তিত্ব লাভ করেছে, উৎপাদন শক্তি ও বিনিময় সম্পর্কের মধ্যকার সম্পর্ক বিশেষভাবে সেনাবাহিনীর মধ্যেই অত্যন্ত স্পষ্ট।

(২) **পুরনো ভাবাদর্শিক ইতিহাসবর্ণনের** (Historiography) **সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক বিশেষত তথাকথিত সাংস্কৃতিক ইতিহাস** শুধুমাত্র ধর্ম ও রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস (এই প্রসঙ্গে পুরনো ইতিহাসের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কেও কিছু বলা যেতে পারে। তথাকথিত নিরপেক্ষ। ব্যক্তিক (অন্যান্যের মধ্যে নৈতিক ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত। দার্শনিক বিষায়দি)।

(৩) **দ্বিতীয় ও তৃতীয়** পর্যায়ের প্রসঙ্গ, সার্বিকভাবে সংশ্লেষিত, **উত্তরাধিকারজনিত** অমৌলিক উৎপাদন সম্পর্ক। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব।

(৪) **এই প্রত্যয়ের বাস্তববাদিতা সম্পর্কে অভিযোগ। প্রকৃতিনিষ্ঠ বস্তুবাদের সঙ্গে সম্পর্ক।**

(৫) **উৎপাদন শক্তি (উৎপাদনের উপায়) এবং উৎপাদন সম্পর্ক নামক প্রাত্যয়িক সংজ্ঞাদ্বয়ের দ্বান্দ্বিকতা** , যে দ্বান্দ্বিকতার সীমানা নির্ধারিত হয়ে যাওয়া দরকার, যা তাদের সত্যিকারের পার্থক্যকে বিলুপ্ত করে না।

(৬) **বৈষয়িক উৎপাদনের সঙ্গে তুলনায় উদাহরণত শৈল্পিক বিকাশের অসম বিকাশ।** প্রগতিকে সচরাচর যে বিমূর্ততায় বোঝা হয়—যেমন আধুনিক চিত্রকলা, সেভাবে তা বোধগম্য নয়। এই অসামঞ্জস্যতা ততো প্রধান নয় বা সক্রিয় সামাজিক সম্পর্কের ভেতর বুঝতে ততোটা মুশকিল সৃষ্টি করে না, যেমন শিক্ষার সম্পর্ক। ইউরোপের সঙ্গে **যুক্তরাষ্ট্রের** সম্পর্ক। কিন্তু এখানে যে আলোচনা আসলেই দুরূহ তাহলো কিভাবে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে অসমান্তরালভাবে আইনি সম্পর্ক বিকাশ লাভ করে। যেমন, আধুনিক উৎপাদনের সঙ্গে রোমান ব্যক্তি আইনের সম্পর্ক (ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনের ক্ষেত্রে দুরূহতা ততো নেই)।

(৭) **এই ধারণা অনিবার্য পরিণতি হিশাবে আবির্ভূত** আকস্মিকতার যথার্থ প্রতিপাদন। কিভাবে। (অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে স্বাধীনতার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত) (সংবাদ মাধ্যমসমূহের প্রভাব চিরকাল বিশ্বইতিহাসের অস্তিত্বে ছিলো না, বিশ্বইতিহাস হিশাবে ইতিহাস হচ্ছে একটা পরিণতির ফল)।

(৮) **স্পষ্টত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য থেকেই শুরু করতে হবে** অন্তর্গত (Subjectively) ও বিষয়গত (Objectively) ভাবে। গোষ্ঠী সম্প্রদায় প্রভৃতি।

১। শিল্পকলার ক্ষেত্রে এটা সবার জানা যে কোনো কোনো কাল-পর্যায়ে নান্দনিক স্ফুটনের সমৃদ্ধি সমাজের সার্বিক বিকাশের আনুপাতিক সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। অতএব তা সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি; বিদ্যমান অস্থিকাঠামো অর্থাৎ এর সংগঠনকেও ছাড়িয়ে গেছে—যেমন আধুনিকদের তুলনায় গ্রীক অথবা শেকসপীয়ার। একথাও এমনকি স্বীকার করা হয় যে, শিল্পকলার কোনো কোনো রূপ—যেমন মহাকাব্য-সেই যুগান্তর সৃষ্টিকারী ক্লাসিক ভঙ্গিতে আর তৈরি হতে পারে না যখন থেকে শিল্পকলার উৎপাদন সমাজে ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়। তার মানে, শিল্পের জগতে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ নান্দনিক রূপের সম্ভাবনা থাকে কেবলমাত্র শৈল্পিক উন্নতির অবিকশিত পর্যায়ে। বিভিন্ন ধরনের শিল্প-রূপের সঙ্গে শিল্পের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক যদি এই হয় তাহলে সমাজের সার্বিক বিকাশের সঙ্গে শিল্পের সংযোগটার হেঁয়ালি আরো কমে আসে। মুশকিলটা বাধে তাদের এই বৈপরীত্যকে একটা সাধারণ ফর্মুলায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে। যখনি তা নির্দিষ্ট করা হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ সব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রথমে গ্রীক শিল্পকলা ও পরে শেকসপীয়ারের সঙ্গে বর্তমান কালের সম্পর্ককে উদাহরণ হিশাবে নেয়া যাক। এটা সুবিদিত যে গ্রীক উপকথা গ্রীক শিল্পের মশলাবারুদই শুধু নয় বরং তার ভিত্তিও বটে। প্রকৃতি ও সামাজিক সম্পর্ক-সংক্রান্ত যে দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করে গ্রীক কল্পনা এবং কাজেকাজেই গ্রীক উপকল্প সৃষ্টি হয়েছে তা কি স্বয়ংক্রিয় চরকা, রেলওয়ে, যানবাহন আর ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ দিয়ে সম্ভব হতো? রবার্টস এন্ড কোম্পানির বিপক্ষে ভালকান, জ্বলন্ত রডের বিপক্ষে জুপিটার, ক্রেডিট মোবিলিএর-এর বিরুদ্ধে হারমেস-এর সুযোগ কতোটুকু? সব উপকল্পই কল্পনায় কল্পনাকে দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করে, আধিপত্য খাটায়, আকার দেয়, সত্যিকারের আধিপত্য অর্জিত হলে তার সমাপ্তি ঘটে। প্রিন্টিং হাউস স্কোয়ারের সামনে ফামার-এর কী ঘটেছে? গ্রীক শিল্পকলা গ্রীক উপকল্পের পূর্ব অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে অর্থাৎ যা লোককল্পনায় প্রকৃতি ও সমাজরূপের অবচেতন নান্দনিক পুনর্বিন্যাস। এই হচ্ছে এর মালমশলা। যেকোনো উপকল্প নয়; অর্থাৎ অবচেতনে প্রকৃতির নান্দনিক পুনর্বিন্যাস থেকে খেয়ালমাফিক পছন্দ নয়

(এখানে সমাজসহ সবকিছুই বৈষয়িক বলে পরিগণিত হচ্ছে)। মিশরের উপকল্প গ্রীক নন্দনকলার ভিত্তি বা গর্ভাশয় হতে পারতো না। কিন্তু সে যাই হোক, একটি প্রকল্প তো বটে। অতএব কোনোক্রমেই তো কোনো সামাজিক বিকাশ নয় যা প্রকৃতির সঙ্গে সকল উপকল্পীয়—উপকাল্পনিক সম্বন্ধ স্থাপনকে বাদ দিয়ে রাখে, অতএব শিল্পীর কাছে দাবি আসে যে তার কল্পনা যেন উপকল্প নির্ভর না হয়।

অন্যদিক থেকে-বারুদে আর সীসায় কি এচিলস্‌কে ভাবা সম্ভব? অথবা ছাপাখানার সঙ্গে ইলিয়াড কে—প্রিন্টিং মেশিনের কথা না হয় বাদই দেয়া গেলো। ছাপাখানার সীসের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত, বিজয়গাঁথা আর কাব্যমূর্ছনার কি অনিবার্য অবসান ঘটে নি? এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্য রচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিতেরও কি বিলুপ্তি ঘটে নি?

কিন্তু গ্রীক শিল্পকলা আর মহাকাব্য যে এক বিশেষ ধরনের সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সেটা বোঝা মুশকিল নয়, মুশকিল হচ্ছে যে তারা এখনো আমাদের নান্দনিক পরিতুষ্টি সাধন করে চলেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রীকযুগ এখনো শিল্পরীতি আর সাধ্যাতীত সৌকর্য্যের আদর্শ হিশাবে পরিগণিত।

একজন মানুষ পুনরায় শিশুতে রূপান্তরিত হয় না, হলে সেটা হবে বালখিল্যতা। কিন্তু সারল্যের মধ্যে কি সে নিজের খুশিকে ফের আবিষ্কার করে না? আর আরো উচ্চতরো পর্যায়ে সে সারল্যের পুনরাবৃত্তি তার নিজেরও করা উচিত নয় কি? প্রতিটি যুগের সত্যিকারের চরিত্র কি সে যুগের শিশুদের চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট নয়? মানবতার ঐতিহাসিক শৈশাবস্থা, এর সবচেয়ে অবিরাম পুষ্পায়ন, যা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, তাকে কি এই শ্বাশত সৌন্দর্য্য চিরকাল জাহির করেই যেতে হবে? অবাধ্য শিশু আর ইঁচড়েপাকা শিশুর অস্তিত্ব আছে। অনেক প্রাচীন মানুষকে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। গ্রীকরা ছিলো স্বাভাবিক শিশু। সমাজের যে অবিকশিত পর্যায়ে তাদের শিল্পের উৎপত্তি ঘটেছিলো, তার সঙ্গে সে শিল্পের মোহনীয়তা আমাদের চোখে কোনো বৈপরীত্যের উদ্রেক করে না। বরং এটাই তো এর পরিণতি, আর এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যুক্ত সত্যকথাটা এই—যে অপরিণত সামাজিক অবস্থা থেকে এর উৎপত্তি এবং একমাত্র যে অবস্থা থেকে সে উৎপত্তি সম্ভব, তা আর কখনোই ফিরে আসতে পারে না।

সহায়ক তথ্য

[১] ডিফোর 'রবিনসন' ক্রুসো' গ্রন্থে বিধৃত ইউটোপিয়া

[২] স্যার জেমস স্টুয়ার্ট (১৯১২-৮০) 'মুদ্রাতন্ত্র আর বণিক তন্ত্রের একজন যুক্তি নির্ভর প্রবক্তা' (মার্কস)। প্রধান গ্রন্থঃ An Inquity into the Principles of Political Economy, Dublin, 1770, (তিন খণ্ড–এই সংস্করণটিই মার্কস ব্যবহার করেছিলেন)

[৩] ফ্রেদারিক বাস্তিআ (১৮০১-৫০) ফরাসি অর্থনীতিবিদ, এবং 'অবাধ বাণিজ্যের তল্পীবাহক' (মার্কস) Laissez faire এবং পুঁজি ও শ্রমের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমর্থক। সমাজতন্ত্রের এক গোঁড়া শত্রু—যেমন লেখায় তেমনি রাজনৈতিক কর্মে' ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত ফরাসি আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন।

[৪] হেনরী চার্লস কেরী (১৭৯৩-১৮৭৯) মার্কিন অর্থনীতিবিদ। পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটমাট করে দেবার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সমর্থন করতেন।

[৫] জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) ইংরেজ অর্থনীতি বিশারদ ও অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিতে র‍্যাডিক্যাল, অর্থনীতিতে রিকার্ডোপন্থী, কিন্তু বক্তব্যে অসংবদ্ধ ও গোলমেলে, রিকার্ডোকে ভালো করে বুঝে উঠতে পারেন নি।

[৬] অর্থাৎ Determination is Negation বা 'সংজ্ঞায়ন মানেই নেতিবাচন'। আদি বস্তুকে যদি এর নির্গুণ সত্তায় উপলব্ধি করতে হয় তাহলে সে নির্গুণ সত্তার ওপর কোনো নাম বা সংজ্ঞারোপ চলবে না। কারণ তাহলে সত্তার নির্গুণত্ব ক্ষুণ্ন হবে। নির্গুণের কোনো গুণ বা নাম থাকতে পারে না। থাকা মানে নির্গুণত্বকে অস্বীকার করা; স্পিনোজা আদি নির্গুণ সত্তা ঈশ্বরকে প্রকৃতি আর প্রকৃতিকে ঈশ্বর বলে গণ্য করতেন। (SPINOZA, Letters, No. 50. to J. Jelles, 2 June 1674)

[৭] জঁ-বাপতিস্ত সে (১৭৬৭-১৮৩২); ফরাসি অর্থনীতিবিদ, পেশায় ব্যবসায়ী; আদম স্মীথের তত্ত্বসমূহের নিম্নশ্রেণীর ভাষ্যকার। এ জন্য মার্কস মন্তব্য করেছিলেন— "শূন্যগর্ভ সে অর্থশাস্ত্রকে ভাসাভাসাভাবে দলা পাকিয়ে পাঠ্যপুস্তক বানিয়ে ফেলেছে"।

[৮] হাইনরিখ ফ্রিডরিখ স্টর্শ ১৭৬৬-১৮৩৫ সেন্ট পিটার্সবার্গে 'রাশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স'– এ অর্থশাস্ত্রের প্রফেসর ছিলেন।

[৯] ১৬শ' শতাব্দী থেকে শুরু করে ফিজিওক্রেটদের আবির্ভাব সময়ের মধ্যে অর্থশাস্ত্রের যে পদ্ধতি বিকশিত হয়েছে মার্কস তাকে এখানে মুদ্রাতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। মুদ্রাতান্ত্রিক পদ্ধতির অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত যে বাণিজ্যতন্ত্র ও কারখানাতন্ত্রের কথা

এখানে বলা হচ্ছে অন্যত্র মার্কস তাকে এক কথায় বাণিজ্যতান্ত্রিক পদ্ধতি হিশাবে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে সচরাচর যাকে Marcantilism নামে অভিহিত করা হয়। এখানে তাদের আলাদাভাবে বিচার করলেও অন্যত্র মার্কস এদের গণ্য করেছেন একই পদ্ধতির ভিন্ন দুটো রূপ হিশাবে। কারণ মার্কসের বিচারে বাণিজ্যতন্ত্র মুদ্রাতান্ত্রিক পদ্ধতিরই রকমফের কেবল।